বাংলার নারী-জাগরণ

প্রথম অধ্যায়

রামমোহন যুগে নারী কল্যাণ আদৌলান

মানুষের সমাজ জীবন যখন প্রথম বিকশিত হয়, তখন সেই বিকাশে নারীর দান অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তার ও কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা অধিক হওয়াতে, প্রাচীনকালে সমাজে নারীর মর্যাদা বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু কালপ্রভাবে, সভ্যতার ধারা যখন অর্থনৈতিক পুর্বিদারবাদে গিয়া পৌঁছিল, তখন নারী অন্তঃপুরবাসিনী দাসীতে পরিণত হওয়াতে নারীর মর্যাদা কমিয়া যায়। তাহার পরে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন মানুষের অন্যতম অধিকার সম্পর্কে চেন্নার উল্লেখ মানুষের মনে দেখা দিল, তখন নারীজাতিরও যে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার একটা দাবী আছে এবং সেই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত না হইলে মানব সমাজের কল্যাণ সত্ত্বে নহে, এই বোধও ধীরে ধীরে জাগ্রত হইতে থাকে।

ইউরোপে এই জাগরণ, দিল, ওয়েন, কিংসলে প্রভুতির চেষ্টায় অতি আরোদিতে নানাপ্রকার নারী কল্যাণ কর্মে বেশ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়া। উঠিয়াছিল; এই বাংলাদেশেও সেই যুগে এই ভাবধারা সেইরূপ ভাবে পরিষ্কৃত হইয়া না উঠিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আধীনভাবে উহার সৃষ্টি হইতে দেখা যায় এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই তাহা এত শক্তিশালী হইয়া। উঠে যে, পৃথিবীর যে কোনও দেশের নারী আদৌলানের সহিত তাহার তুলনা চলে। এমন কি, কোন কোন বিষয়ে প্রগতিশীলতায় এদেশ ইউরোপকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।
মানব-কল্যাণ বক্ষের ঋতুক রাজা রামমোহন রায়ের কোলগ্রাস্ত নারীজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাহার ভিক্টর জমিকলে নারীজাতির সাহায্যে তাহার জীবন রক্ষা পায়। নারীর এই সাহসিক কার্যযোগ্য রামমোহন মুখ্য হন এবং তাহার পর হইতে নারীজাতির হৃদয় হরিদশ। বিশেষতঃ তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া পড়েন। রামমোহনের অত্যন্ত আগ্রহী ব্যাখ্যায় মিস মেরী কার্পেন্টার লিখিয়াছেন যে—

“ভিক্টরবাসিনী রমণীগণের সন্ধ্যে ব্যবহারের জন্য তিনি নারীজাতির প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধা ও কূটজ্ঞতা অনুভব করিতেন।”

তাহার পর রামমোহনের জ্ঞান ভাং। জগমোহনের মৃত্যু ঘটিলে, তাহার বিবাহের পত্নী অলকমঞ্জী দেবী সহস্রাৎ হইলে, সহস্র প্রথার দোষ সম্পর্কে রামমোহনের যে অঙ্গুলিত আঁধারে, তাহাতে তিনি এই প্রথা নিবারণ- করে আত্মোপনার মুখ করিয়া দেন।

খ্যাতিজ মিশনারী আবেদন

রামমোহনের পুর্বে খ্যাতিজ মিশনারীগণ ও বিশেষভাবে ফোট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার বুকানন সত্তী প্রথার নির্মতার বিকৃতে আবেদন তুলিয়াছিলেন। ডাক্তার বুকাননের চেষ্টায় উক্ত কলেজের অধ্যাপক কোক্সবাক ও কেল্লর তাত্ত্বিক হইলেন। রামমোহনের দুষ্করতা কলেজের দৃষ্টি হিন্দু পণ্ডিত ছয় মাসের জন্য বিনির্বাচিত হইলেন এবং এই সময় শাস্ত্র প্রমাণ “গুরুদ্বার সংগ্রহ” নামে একটি পুস্তকে প্রকাশ করেন।

* Vide Buchanan’s Christian Researches in Asia ( pp. 39-41 ) and Memoirs of the Expedition of an Ecclesiastical Establishment ( pp 114-15).
যে সমস্ত তথ্য ইহাদের চেষ্টায় প্রকাশিত হয় তাহাতে সতীদাহ প্রথার প্রতি ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেন্সীর মনে এই “অন্নাভাবিক ও নৃশংস প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা যাইতে পারে কি না” বেশ গণ্য অন্নস্বামনের প্রথা হয়ে গেলো।

সেইজন্য তাহারই আদেশে ভারত সরকারের বিচার বিভাগের

সেক্রেটারী ডিগ্রেয়েল সাহেব, নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গূড সাহেবকে আদালতের পত্তিপত্রের নিকট এই প্রথা হিন্দুধর্মাদুর্মুক্ত কিনা তাহা অন্নস্বামন করিবার জন্য ১৮০৫ খ্রীঃপূঃ সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক পত্র লেখেন। নিজামত আদালতের পত্তিত বন্ধুমায় শক্তি এই অভিযোগ জাপন করেন যে—

“বাহারা পত্তিপত্রসম্পন্ন জন্য প্রস্তুত হন, তাহাদের অভ্যাস শিখ স্ত্রী
গাঁকিলে, অন্যসবা অবস্থা হইলে, খুতুকাল হইলে, কিংবা নাবলক অবস্থা হইলে, তাৰহারা সহস্রতা হইবার যোগ্য নহেন। উপরিতে উক্ত প্রতিভূ কল্লুলি না গাঁকিলে সহস্রতা হইতে কোন নিষেধ নাই। কোনও উৎকট তৃদ্ধ বা মাদক ধ্বনি সেবন করাইয়া কোন গ্রীলোককে সহস্রতে উত্তেজিত করা অধ্যাপন ও গৌণচার বিরুদ্ধ। ঐতিহ্যে আধ্যায় বা উন্নত করার অবৈধ।

সহস্রতের পূর্বে গ্রীলোকদিগকে সঙ্কল্প করিতে হয় এবং অধ্যায় কতকগুলি বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

এই অভিমত নিষ্কাম আদালত ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের পাচই জুন তারিখে ভারত সরকারের গোচরে আনেন।

তাহার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নিষ্কাম আদালতের পদার্থবৃহৎ এ বিষয়ে তাহাদের মত ব্যক্ত করেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মতামত দানকারী পদ্ধতিগতের মধ্যে পণ্ডিত মৃত্যুকাল বিশ্বাসকার অন্তর্ভুক্ত। তাহার এই মতামত দান ব্যাপারকে কেশ করিয়া কেহ কেহ মৃত্যুকালকেই সত্তাধার নিবারণ আন্দোলনের অষ্ঠ প্রতিপল করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুকালের বহু পূর্বেই ঘন্থাম শর্ষী অনুপ্রাণন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে মৃত্যুকাল একক ছিলেন না; তাহার সহিত অপর দুইজন পণ্ডিতও অনুপ্রাণন মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আদালতের বেতনভূক ক্ষতিগ্রস্থ আদালতের আদেশে আইন সম্পর্কে এই অভিমত প্রদানকে তাহাদের জীবনের অভিপ্রায় বলা চলে না।

তাহারা বদি সত্যঃসত্যই এই অভিমতকে সম্মরণে প্রচলিত দেখিতে চাহিয়াছেন তবে এই অভিমত দ্বারা তাহারা ক্ষতি পাইতেন না, সত্যঃসত্যের প্রায় নৃশঃপ্রা যাহাতে বিলুপ্ত হয় তাহার জন্য রীতিমত আন্দোলন হয় না।

করিয়া দিতেন। রামমোহন ও তাহার বক্তৃত্ব এই প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তুলনা, মৃত্যুমাত্র ভাঙাতে যোগদান করেন নাই।

নিজামত আদালতের অভিযোগ পাওয়ার জন্য ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তারিখে কতকগুলি অবস্থার ভারত সরকার সত্তীদাহ নিবারণ করিতে সরকারী কর্মচারীদের আদেশ প্রদান করেন এবং ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা আশ্বাসার তারিখে নিজামত আদালত হইতে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটদিগকে মাদক দ্বয় সাহায্যে উপাদান করিয়া। কোন নানাকে সতী হইতে প্রেরণা-নামের ফলে সতী হইবার উপক্রম হইলে তাহা নিবারণের আদেশ প্রদান করেন।*

রামমোহনের দান

রামমোহন রায় সেইজন্য সত্যসত্যই এই আন্দোলনের প্ররূপক। তিনি ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দ হইতে সতীতাহ প্রথা নিবারণের জন্য রীতিমত আন্দোলন স্বীকার করিয়া দেন। এই আন্দোলন আর্থ করিয়া পুরুষ তিনি যে সতীদাহ নিবারণ করে গ্রহণ হইলেন তাহার প্রমাণ আছে। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি কালীবার্তায় একটি সতীকে সতী হইবার সংকল্প হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহ। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের Asiatic Journal-এ উল্লিখিত আছে।

সরকারী আদেশ হিন্দুধর্মের অপবাদ করে, এই কারণ দর্শায়। কয়েক-জন হিন্দুনায়ক ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকারের নিকট ঐ আদেশগুলি প্রত্যাহারের নিবেদন জানাইয়া হইবার দুইখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় আবেদন আগষ্ট মাসে প্রেরিত হয়। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের Asiatic Journal-এ উত্তর সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

* Ibid—pp. 41
হিন্দুনায়কগণের এই আবেদনে স্বীকার হইয়া রামমোহন সত্ত্বে প্রধান অধ্যাদেশ প্রকাশ করিয়া। একটি স্বত্তিত্তিত্তিক রচনা করিয়া উহা আত্মীয় সভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশ করেন ও সত্ত্বের প্রথা সম্পূর্ণ নিবারিত করা। ভারত সরকারের পক্ষ যদি সত্য না-ও হয় তাহা হইলে যে-সমস্ত বাধা এই প্রথার সম্পর্কে সরকার পক্ষ হইতে জারী করা চুক্রাছে, তাহা রাখিয়া আরও নতুন নতুন বাধা সৃষ্টি করিতে অত্যন্ত সভার উদ্যোগে অনুরোধ জাপন করিয়া। একটি প্রত্য-আবেদন প্রেরণ করিতে রামমোহন যত্নবান হন। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে মার্চসহরবান্দ সর্বোচ্চস্থানীয় নামে রামমোহন একটি পত্র লিখিয়া এই আবেদনের পোষকতা করেন।

ঐহার কিছুদিন পরে প্রবর্তক ও নির্বর্তকের আলোচনাকালে সত্ত্বের যে অত্যন্ত অশাকীয় ও অমানুষিক আচার, তাহা প্রতিপাদন করিয়া বাংলা ও ইংরেজিতে পুষ্টিকা একাশ করেন, এই পুষ্টিকের প্রকাশ হইলেন আত্মীয় সভার সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (Vide Calcutta Journal 1819. April 10, pp. 119) এই পুষ্টিকার ইংরেজি অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে Government Gazette ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর ও Calcutta Journal ২৫শে ডিসেম্বর পুনর্নির্দেশ করেন। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমে রামমোহনের শিষ্য হরচন্দ্র রায় সম্পাদিত সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র “বাঙ্গালা গেজেটিতে বাংলা পুষ্টিকাটি পুনর্নির্দেশ হয়। রামমোহনের এই পুষ্টিকা যে আদেশের তুলে তাহাতে ভীত হইয়া রক্তপীল দল উহার উভয় ক্ষেত্রে ঘোষালবাগানের চতুর্থাগাঢ়ের পশ্চিম কাশিনাথ তর্কবাদীকে দিয়া “বিধায়ক নির্দেশক সংবাদ” প্রকাশ করেন।

* কাশিনাথ তর্কবাদী দুই পুষ্টিকের লেখক; শ্রীযুক্ত রজনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যদ্যপি উহা কাশিনাথ তর্কবাদী প্রণীত লিখিতাছেন।
জ্যোত্রিষের ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের প্রারম্ভে রামমোহন সত্তিদাই নিবারণকরে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা প্রচার করেন ও Second conference between an opponent and a supporter of suttee নামে ইংরেজি অনুবাদ গভর্নর জেনারেল লর্ড হেটিংসকে উৎসর্গ করিয়া ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৮২০) তারিখে প্রকাশ করেন। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে নিজস্ব আদালতের প্রধান বিচারপতি লিটার (Leycester) সাহেব ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে এক মন্তব্য বলেন যে, যে-সমস্ত অঞ্চলে সত্তিপ্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল না, সেই সমস্ত অঞ্চলে উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হউক। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, এলাহাবাদ, বেরিলি, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ড ও কুলি অঞ্চলে এই আদেশ জারী হওয়া উচিচ।

দ্বিতীয় বিচারপতি কুটিনি সাহেব অভিমত প্রকাশ করেন যে, সবগুলোই এই নৃশংস প্রথা রহিত করা সরকারের কর্তব্য। অন্ত দুইজন বিচারপতি এই আদেশ দানের মোক্ষিকতা স্বীকার করিয়া উহা জারী হইল প্রায় মধ্যে অস্থায়ী রুদ্ধ পাইবে এই অজ্ঞাতে কোনও ব্যাপক আহিনজারীতে উহারা অনিম্ন প্রকাশ করেন। তবে ইহাদের মধ্যে বিচারপতি ডোরিন বলেন যে, কেবলমাত্র একটি জেলার উহা রহিত করিয়া ফলাফল দেখা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, হুগলি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে নিষেধ প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এই সকল অভিমত পাইয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড হেটিংস ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই অভিমত প্রকাশ করেন যে “এই দ্বিতীয় অভিমতের কোনওটিকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আন্দোলনের ফলে ক্রমঃ এই প্রথা উঠিয়া যাইবে।”

পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড আহমাকের প্রার্থনায় নিজস্ব আদালতের বিচারপতিগণ সত্তিদাই প্রধান বিচার উন্নতোত্তর জীবন মন্তব্য
করিয়া উক্ত প্রধান নিবারণ দাবী করিতে থাকেন, কিন্তু লড় আমরাথি ও জ্ঞানের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হওয়াতে উক্ত প্রথা নিবারিত হয় না। পরে তার উইলিয়াম বেটস্টেক্সের শাসনকালে নিজেদের আদালতের বিচারপতিগণ ও ভারতের সামরিক কর্পচারিগণ সতীদাহ প্রথা নিবারণ চাওয়াতে বেটস্টেক্স রামমোহনের সহিত উক্ত প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করিতে থাকেন। রামমোহনের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তিনি সতীদাহে সাহায্য করা অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই কার্যে সহায়তাকারীদের অবমুক্তি বিষয়ে প্রাণদণ্ড হইতে পারে ইহাই ঘোষিত হয়। এইভাবে পরোক্ষভাবে সতীদাহ প্রথা তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

রক্ষণশীলদলের প্রতিবাদ

রক্ষণশীলদলের মুখপত্র সমাচার চার্কেস্কার ধ্রুবপ্রফুল্ল পক্ষ হইতে এই বিদ্ধির তীত্তি বিরোধ উঠে এবং বিদ্ধি তুলিয়া দিবার অনুরোধ করিয়াই কেউ অফ ডাইরেক্টর ও পার্লামেন্ট আবেদন-লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা হয়; এইজন্য কলিকাতার রেপুটি শেরফিক ও অ্যাটর্নী মিট্টার ব্যাধিকে উত্তাহার নিযুক্ত করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী কলিকাতার আউটপুট অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন গবর্ণর জেনারেলের সমীপে ধর্ষণভাব কর্তৃক প্রেরিত হয়।

নিবারণ-প্রয়োগীদের প্রচেষ্টা

সতীদাহ নিবারণকল্পে ধারায় চেষ্টা ছিলেন, তুহারাও নীরব রহিলেন না। কলিকাতার পৃষ্ঠ অধিবাসীদের পক্ষ হইতে আউটপুট জন অধিবাসীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন এবং রামমোহন রায় ও তুহার
অনুচরদিগের পক্ষ হইতে তিনশত ব্যক্তির বাক্যারূপকৃত এক আবেদনে নূতন
বিধিকে সমর্থন করা হয়।

ধর্ষসভা ইংল্যান্ডে আগুলীল চালাইবার জন্য এগারো হাজার হই শত স্তুত
টাকা চাইতে যোগ দিলেন।

১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট রাজা রামমোহন রায় কলিকাতার
টাউনহলে এক সভা করিয়া লড় উইলিয়াম বেস্টিকের সতীদাস নিবারণ-
বিধি প্রণয়ন করিয়া। তিনি যে সংগঠন দেখাইয়াছেন, তজ্জাত অভিনন্দন
প্রদান করেন। এই অভিনন্দনে রামমোহন রায়, সমাদ কোমুদীর হরিহর
নয়, আম্বুল সভার কালীনাথ রায়, অনন্দপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধারণার
ঠাকুর প্রমুখ তিনশত ব্যক্তির বাক্যের ছিল। বাঙ্গালা অভিনন্দন পত্রটি
কালীনাথ রায় ও ইংরেজি অনুবাদটি হরিহর দত্ত পাঠ করেন। *

রামমোহনের প্রবর্তিত আন্দোলনে ভীত হইয়া ধর্ষসভা পক্ষিগণ
তাহাকে “প্রবর্তক নিবন্ধক” প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই “সতীদাসী”
বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন এবং তাহার ও তাহার অনুচরদিগের
বিরুদ্ধে সামাজিক নির্যাতন আরম্ভ করিয়া দেন। নির্যাতনের বধে
তাহার সম্ভাব্যতা হইলেন না, তখন রামমোহনকে হত্যা করিবার ও
নাশ আরম্ভ হয় এবং একাধিকবার অশ্রদ্ধে সজ্জিত আক্রমণকারী দল
কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। একবার এইরূপ আক্রমণের হত্যা হইতে
তাহাকে তাহার স্বীকার মহেন্দ্রোপাধ্যায় মার্টিন রক্ষা করেন এবং এইরূপ
আক্রমন বাহাতে সম্ভব না হয় তজ্জাত আগস্টের সাহায্যে সজ্জিত
হইয়া মিলিয়ার মার্টিন কয়েকদিন রামমোহনের মাণিকতলার বাটাতে অবস্থান
করেন। মার্টিন ইহার একটি মুগ্ধত্ব বর্ণনা লিখিত করিয়া গিয়াছেন।

* Bengal Chronicle January 14, 1836.
নিজামত আঞ্চলিতের পঞ্চবণের অভিষিক্ত কোটের হুকুমে ইংরেজ প্রভুদের সমস্ত সাধনের জন্য প্রদত্ত হয়েছিল; সতীসাহ নিবারণকৃতে পঞ্চবণের কিছু অংশ আগেই ছিল না। যদি তাহাদের সেই আঞ্চল আগেই থাকিত তবে তাহারা উহা নিবারণের জন্য কোন না কোনও আঞ্চলক মূল করিয়া দিতেন। নিজামত আঞ্চলিতে প্রদত্ত অভিষিক্ত বিশ্ব এই সম্পর্কে এরাখান কোনও মভামত ব্যক্ত করিতে তাহাদের দেখা যায় না। এমন কি, ফোট উইলিয়াম কলেজের যে সমস্ত পঞ্চত কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাসনের ঘাত প্রেরিত হইয়া সততাগণকে নিরস্ত হইবার জন্য শাসনীয় মভামত দিয়া উদ্বোধিত করিতেন, তাহারা বেশ অবগত ছিলেন যে সতীসাহ প্রথা সমর্থনকারী বলিয়া তাহাদের পরিচয় কর্তৃপক্ষ পাইলে তাহাদের চাকুরী থাকিবে না, কারণ ১৮০৩ খ্রীঃ সালের জুন মাসে গোলকনাথ শর্মার মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নী সহগামিনী হইতে ইচ্ছুক হওয়াতে তাহার ভাস্তা ফোট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় চিহ্নার অর্থ প্রদান করেন বলিয়া তাহার পাতিদিবার জন্য কার্য হইতে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। কোনো মার্শ্চমাণ তাহার জন্মে এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন যে, “We, however thought it now our duty to bear a testimony against this infernal practice, by discharging the elder
brother who kindled the fire, from our service for ever, as a man whose hands were stained with blood.”

"The enlightened faith, the fervent and devoted spirit of the early missionaries, as well as the devoted labours of the English church, have been instrumental in bringing this people to a state of salvation. But it is only within the last generation that the work of the missionaries has been truly appreciated. In 1818, the first efforts were made to establish a mission in this country, and from that time onwards, the work has gradually increased, until it has reached its present extent.

The progress of the work has been marked by many valuable achievements, and it is now the boast of the country, that it is in a state of education and civilization, which is the result of the labours of the missionaries. It is to be hoped that the work will continue to increase, and that the people will be led to a better knowledge of the truth, and a more hearty adoption of the faith of the Gospel."
বাংলার নারী-ক্ষেত্র

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল হুরকার পত্রের মিশনের নামক একজন ইংরেজ মহিলা রামমোহনের এ সম্পর্কে কৃতিত্বের কথা সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

ইংল্যান্ডে আন্দোলন

ব্যাধির ইংল্যান্ডে পিটিশন দিলে পর রামমোহন তাহার বিরোধিতা করিয়া। সতীদাহ নিবারণ বিধির সমর্থনে যে পিটিশন প্রদান করেন তাহা ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই পার্লামেন্টের হাউস অফ লর্ড সভায় মার্কিন ইংল্যান্ডের দ্বারা উত্তেজিত হয়।

রামমোহন এই সময়ে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে বোর্ডিং এক-বিধি প্রণয়ন করেন তাহার সমর্থনে “A pamphlet containing some remarks in vindication of the resolution by the Government of Bengal in 1829 abolishing the practice of female sacrifice in India” নামে এক পুস্তিকা ইংল্যান্ডে প্রচার করেন।

১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রিং কাউন্সিলে বিধির সমর্থন ও প্রতিবাদের আপেলের গুনান্নী আরম্ভ হয়। বিধির বিরুদ্ধপক্ষে আপেল সমর্থন করেন ডাক্তার লুসিংটন, মিটার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও মিটার ম্যাকডুগাল ও তাহাদের বিরুদ্ধপক্ষে মত ব্যক্ত করিতে উপনিষিত হন ইংল্যান্ডের অ্যাটর্নি জেনারেল জে, ক্রারেট, তার সি, ওয়েলরেল, তার ই, সাজেন ও সারেন্ট স্যাপ্পটি। রামমোহন শুনানীর সময় উপনিষিত ছিলেন।

সতীদাহ নিবারণে উল্লাস

প্রিয় কাউকের অনুমোদনে সংবাদ এই বিধি রোধ করার পক্ষে যে আপনার দর্শনগত পক্ষ হিতে করা হইয়াছিল ভাবা আগ্রহ করেন।

এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের দ্বীপভূমি পত্রিকা রিফর্মারের ইংরেজি সংস্করণের এক অতিরিক্ত সংখ্যা (Extraordinary Issue) ৫ই নভেম্বর প্রকাশিত করা হয় এবং এই অনন্য-সংবাদ সাধারণে অপার করা হয়। বাঙালির সংবাদ-পত্র জগতে ইহ একটি আধুনিক ব্যাপার, কারণ কেনও বিশেষ ব্যাপারের প্রচার- তৎপরতার প্রয়োজন অনুভব করিয়া extraordinary সংখ্যা প্রকাশ সম্পর্কে এখানকার সংবাদপত্র মহলে ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। রিফর্মার
চলাপায় এমন কি ইহার সঙ্কায় পাওয়া কঠিন। তবে ১৪ই নভেম্বর ১৮৩২
শুক্লাদের সমাচার দণ্ডের এক সংবাদে ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

দর্পণ লিখিতেছে “গত ৫ই নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় সময় রিফর্মার
একটি অভিনব অর্থাং শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইংরেজি ভাষায়
যে সমাচার পত্র শ্রীভূতানন্দ সেন স্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া
পাকেন সেই রিফর্মার কাগজের একখানি অতিরিক্ত পত্রীতে প্রকাশ করে
যে বিলাতের সতীর মোকাফত। তিন দিবসের বিচার হইয়া শেষ ভিডিমিস
হইয়াছে অর্থাৎ আপীলকারীদের প্রার্থনা পূর্ণ হইল না।”

ব্রাহ্মসমাজের ভাস রক্ষক (ট্রাস্টিগণ) বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রমানাথ ঠাকুর
ও রাধাপ্রসাদ রায় এই আপীল না গ্রহণ করার জন্য সপরিষদ সম্পাদকে
ধন্যবাদ দিবার জন্য ১০ই নভেম্বর তারিখে ব্রাহ্মসমাজ-গুহে এক প্রকাশ
সভা অনুষ্ঠিত। ৬ই নভেম্বর পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দিলেন।
১০ই নভেম্বরের সন্ধার ভারত-হিন্দী, রামমোহনরায়ণ মিশ্রের প্রথম
প্যাট্রল, ক্যাপ্টেন এভারেই ও ডেভিড হেয়ার উপস্থিত ছিলেন।
বাংলার নারী-জাগরণ

রাধাপ্রসাদ রায়ের প্রস্তাবে ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রামচন্দ্র গাঙ্গুলীর
সমর্থনে ধারানাথ ঠাকুর সভাপতি হন।

কালীনাথ চৌধুরী ধনবাদ জাপন করার প্রস্তাব উৎফুল্লন করিলে,
মধুরানাথ মল্লিক ও প্রসাদকুমার ঠাকুর ও রাধাপ্রসাদ রায় উহার সমর্থন
করেন। শ্রামলাল ঠাকুর দ্বিতীয় প্রস্তাব উথাপন করেন। এই প্রস্তাবে
সমস্তের অভিনন্দন পত্র প্রস্তুত করিবার কমিটি ধারানাথ ঠাকুর,
প্রসাদকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায়, মধুরানাথ মল্লিক, রাধাপ্রসাদ রায়,
হরিঘর হর ও রামচন্দ্র বিভাগবাগিশকে লইয়া গঠন করিতে বল। হয়।
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব প্রস্তাবর পোষকতা করেন। সভাপতি ধারানাথ
ঠাকুর প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু ইংরেজি ও বাঙালি। এই উভয় ভাষায়
ব্যাপন শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত শ্রামলাল ঠাকুরের ভাষায়
অতি অল ব্যক্তির আচ্ছ, যেহেতু এই কমিটিতে ঐ চুইজনকে গ্রহণ
করা হউক।

চন্দ্রশেখর দেবের প্রস্তাবে ও শ্রামলাল ঠাকুরের সমর্থনে রামমোহন
রায়কে এই ব্যাপারে শ্রীহার অনুমোদ পরিশ্রমের জন্য ধনবাদ দেওয়ার
প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীহার পর শ্রীযুক্ত রজনো বঙ্গোপাধ্যায় (পরে
রেভারেও ) ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র রামমোহনের এই বিষয়ে বে নিষ্ঠা ও
পরিশ্রম তাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তব্য করেন।*

রামমোহন জীবিত থাকাকালে বাঙালি দেশে প্রকাশ জনসভায়
এইরূপে সক্ষমপ্রথমে তাহার স্মৃতি হয়।

সত্য পক্ষে ও দাহ নিন্দার প্রথ্যার বিকৃত্তে ধর্ষ সত্য পক্ষে অর্থ গ্রহণ
করিয়া যে সব ইংরেজ ব্যবহারকীর্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তথাধ্যে

* সমাচার পর্ণ ২৪শে নভেম্বর ১৮৫২।
ডিবিউতার বিটন (Bethune) পরে এই নৃশংস প্রথা সমর্থনের জন্য অহংশোচনায় দক্ষ হন ও এই পাপের প্রায়লিখত করিবার জন্য ভারতে আইন সচিবরূপে আসিয়া গ্রীষ্মকা বিষ্ণুরে আগ্নেয়কোলাহল করেন। বিদ্যাসাগরের সাহচর্যে তিনি ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে বিটন বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও দুই বছর সময় সম্পূর্ণ এদেশে গ্রীষ্মকা বিষ্ণুরের জন্য দান করেন। সতীদাহ নিবারণ প্রচেষ্টার ইহাও পর্যাপ্ত করে।

রামমোহন ও গ্রীষ্মকা

সতীদাহ নিবারণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় নারীজাতির অধিকার সম্পর্কে রামমোহনের মনে অনেকগুলি সংস্কার চিন্তা অনুষ্ঠিত হইয়া উঠে। তিনি “প্রবক্তা নিবন্ধকে” নারীজাতির হীন দশার কারণ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

“গ্রীষ্মকার্গের শায়িত্রিক পরাক্রম পুরুষ হইতে প্রায় নূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাতে আগন। ইহাতে দৃঢ়লজ্জা লাগে যে উপর পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা উভাবতঃ যোগ্য ছিল, তাহা ইহা ইহা উপার্থিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, উভাবতঃ তাহারা এই পদ প্রশ্নের যোগ্য নহে।”

গ্রীষ্মকাগণ বুদ্ধিতে পুরুষ অপেক্ষা হীন এবং সে কথা তাহারা শিক্ষা লাভের যোগ্য। নহে বলিয়া যে বিচার পুরুষগণ করিয়া আরম্ভের হেন, তাহার বিকৃতে রামমোহন বলেন যে—

“গ্রীষ্মকাগণের বুদ্ধির গরিমাকে কোন কালে লইয়াছেন যে তাহাগণের অন্যত্ব কহেন। কারণ বিশ্বাসিকাঃ এবং জ্ঞানিকাঃ দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অমৃতব ও গ্রীষ্ম করিয়া না পারে, তখন তাহার অমৃত্তি কহা সম্বন্ধ হইতে পারে; আপনারা বিশ্বাসিকা,
বাঙালি নারী-জাগরণ:

অনৌপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুঝিতেন হয়, ইহা কিরূপে নিষ্ঠুর করেন? বরং লীলাবতী, ভাঙ্গামতী, কণটি রাজস্বরু, কালিদাসের পত্রী, প্রতৃতি বাহাকে সাহাকে বিশ্বাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্বোপরি ব্যক্তি। রূপে বিখ্যাত আছেন।

বিশেষতঃ বুঝদারণ্যক উপনিতয় ব্যক্তি প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত চরণ-ব্যবহার তাহা যাজ্ঞবলক্ষেপন দেশের অধিকাংশ আপন মৈত্রেয়কে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ী ও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃত্য হয়েন।

স্ত্রীশিক্ষায় মিশনারী-প্রচেষ্টা

রামমোহনের স্ত্রীশিক্ষায় প্রতিপূর্বক এই প্রকাশ-উক্তির পূর্বে যদিও পৃষ্টিয়ানি মিশনারীগণ এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, এদেশীয়গণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন বর্তমান রূপে এদেশীয় সর্বদল হইলেও প্রণম প্রকাশ্য উক্তি। ইহার অনতিপর রাজা রাধাকান্ত দেবের পোষকতায় স্কুল বুক সোসাইটির ও হেয়ার সাহেবের স্কুলের পঞ্জিকা গোরমোহন বিদ্যাল্যকার মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া নারীজাতির স্ত্রীশিক্ষাদানের পোষকতা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের উক্ত পৃষ্টিয়ানি এবং গৃহে শিক্ষা লাভ করিয়া কোনও রমণী পরিবর্তে গ্রহণ করিয়া চাহিলে স্কুল সোসাইটির বালকগণের পরিবর্তে গ্রহণ সময়ে নিজ বাটিতে রমণীগণের পরিবর্তে গ্রহণ করিয়া এদেশীয়গণের এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন হইলেন। কিন্তু প্রথমে তাহি বিদ্যালয়ের ছাত্রী গ্রেঞ্জকার বিশেষ ছিলেন, পরে বেশুন সাহেব স্কুল স্থাপন করিলে নিজ বাটিতে একটি স্কুল স্থাপন করেন।

হেয়ার সাহেবের প্রথমে স্কুল সোসাইটির স্কুলে বালিকাগণ পড়িতে পারিয়া; কিন্তু এ বিষয়ে কমিটির মধ্যে মতভেদ হওয়ায় ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে
বাংলার নারী-জাগরণ

Female Juvenile Society নামে একটি নতুন সমিতি গঠন করিয়া। সেই সমিতির হস্তে বালিকা বিদ্যালয়ের ভার দেওয়া হয়। পরে ইংল্যান্ডে British and Foreign School Societyর উদ্যোগে মিস কুক নারী একজন মহিলা এদেশে শ্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের জন্য আগমন করেন; তিনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এদেশে পৌঁছেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে উইলার প্রথমে ২৪টি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, কিন্তু কোনও বিদ্যালয়ে বেশী সংখ্যাক বালিকা ছিল না। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে নেটিভ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিল্মেল এডুকেশন নামক একটি সভা স্থাপিত করিয়া। সেই সভার হস্তে মিস কুক-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি পরিচালনের ভার দেওয়া হয়। এই সকল স্কুলে সাধারণতঃ বাঙালি, মুস্লিম, নন্দীনাথ, জেলে অনুষ্ঠিত সমাজের নির্মূলতা শিখির নারীগণই পড়িতে আসিতেন।

মধ্যবিত্ত ভরা বালিকাদিগের জন্য সরকারী ভারতীয় পরিচালিত প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় বারবার ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। প্যারাচারণ সরকার ও নবীনকুঞ্জ সিতার তাহার উদ্যোক্তা।

বঙ্গের বাহিরে বালিকা বিদ্যালয়

বোধাই শহরেও ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বোধাই এদেশের সকল হিতকর কার্যের মূল নৌকি ফাটখানি; তাহার ছাত্রগণ ইংরেজ লিটারেরি অ্যাং সার্কেলস্কিফিক সোসাইটির নামে আনালোচনার জন্য একটি সভা স্থাপিত করেন এবং সেই সভার চেষ্টায় বোধাই শহরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পার্শ্বী সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি ও কইন্দিগের জন্য তিনটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত অস্থির ছিল; সব কয়েকটি স্কুল মিলাইয়া তিনটি মাত্র
নারীর দায়ীত্বকারে রামমোহন

প্রচলিত প্রথামতারে হিন্দু বিধবাগণ ন্যায়বিচার সম্পর্কে অধিকারের হইতে না। রামমোহন এই প্রচলন বিস্তার করেন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে "Brief Remarks Regarding Modern Encroachment on Ancient Rights of Female according to Hindu Law of Inheritance" নামক পুস্তক রচনা করেন।

রামমোহন এই পুস্তকে প্রতিপাদন করেন যে ইউরোপীয় ব্যবহার শাসক অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুশাসনে দায়িত্বকারের সম্পর্কে নারী-জাতির প্রতি ভায়িবিচার অনেক অধিক করা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী দীক্ষাকারণের দোষধর নীলাচল ফলে তাহারা সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বিশ্বাস যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই প্রমাণ করেন যে, দীক্ষাকারণের সিদ্ধান্ত অপার্থিত। একপক্ষে শাস্ত্রীয় পত্রী মৃত পতির সম্পর্কতে পুত্রদের ভাগ সমানাধিকারী। একাধিক পত্রী খালিলে তাহারা প্রত্যেকেই স্থানীয় সম্পর্কে অঙ্গভাগীন। সপ্তদশী পুত্রী পুত্রীনাতে পিতাভক্ত বিপরীতে বাহাতে সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে না পারেন, প্রাচীন ঋষিগণ সেইস্থলে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। দায়বদ্ধ ও দায়আগের লেখকের ভুল করিয়া। এই অভিমত প্রদান করিয়াছেন যে, নারী যদি

* ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশী পিতাভক্ত হিন্দু সেইস্থলে দায়আগে নৌকির বোঝাই সহরে নারীশিক্ষা সম্পর্কে এক বক্তা হইতে।
জীবন্দ্বারী পুত্রহীন পত্নীকে সম্পাতি ভাগ করিয়া না দিয়া যান, তাহা হইলে পুত্রহীন বিবাহী তাহার মৃত্যু স্থানীর বিষয়ে কোন অংশেরই অধিকারী হইবেন না; পুত্রবতী নারীর বিষয়ে অধিকার নাই, পুত্রগণই বিনতের অধিকারী, এই মতও হারান।

এই ব্যবস্থার ফলে, বিবাহী নারীকে পুত্র ও পুত্রবুদ্ধিগের অন্তঃগ্রহণ উপরই নির্ভর করিতে হয় এবং অনেক সময় অনাদর ও অবজ্ঞা দিন যাপন করিতে হয়। বহুবিবাহের প্রাথমিকের জন্য বিবাহী বিভাগ সংখ্যা বড় অল্প নহে; সপ্তদশী পুনরায় নিকট অনেক সময়ই তাহাদের লিপ্যন্তরণে বর্জন করিয়া হয়। দায়িত্বকারের এই অভাব ব্যবস্থার ফলেই যে ভারতের অভাব প্রদেশ হইতে বাংলা দেশেই সহজে ও বহু বিবাহের অধিকার দেখা গিয়াছিল, ইহাও রামমোহন অঙ্গুলার করিয়াছিলেন।

নারীর মুত্রের পর বিবাহের দিকে দিয়া নারীজাতির মনে সেই দৃঢ়তম জীবন যাপনের সাধ সত্বা ভবন্তই করিয়া যায় ও পরলোকে স্মরণ থাকে। আসাইতেই তাহারা সহজেই হইবার অনুযায়ী হয়েন। অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকিলেও বিবাহের ভাগ হইবে না, পুত্রগণের বিভবের অংশ সমান পাইবে। এই জন্য পুত্রবুদ্ধিগণ বহু বিবাহের প্ররোচনিত করে; বিনয়ভাগের ভর থাকিলে বহুবিবাহের প্রথা কম হইয়া যাইত। এই সব কারণে শাস্ত্রাদিক অভিলভ্য করিয়া তাঁহাকে বিবাহের প্রথা দায়িত্বের দায়িত্ব এখন উক্ত প্রস্তা রচনা করিয়া। দৃঢ়তম বিষয় এই যে আজ পর্যন্তও রামমোহন রায়ের এই জীবন-নংঙ্গ দায়ী সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাই।

রামমোহন ও কষ্টপুন

কষ্টপুন লইয়া কষ্ট বিবাহের কুপথা তখন করেক শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা ও কায়স্থের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থসংস্থ কষ্টর পিতারা স্ত্রীবিশেষে
কষ্ট, বৃদ্ধি ও অঙ্গীন ব্যক্তিরের সহিত আপন কৃষ্ণার বিবাহ দিত। এই গ্রেণা সম্পর্কে রাজা লিখিয়াছিলেন যে—

"Such Brahmans and Kayasthas, I regret to say, frequently marry their female relations to men having natural defects or worn out by old age and disease, merely from pecuniary considerations, whereby they either bring widowhood upon them soon after marriage or render their lives miserable. They do not only degrade themselves by such cruel and unmanly conduct but violate entirely express authorities of Munoo and all other ancient lawgivers, a few of which I quote"—

রাজা কঠাবিক্রয়ের বিকৃত্তা শাস্ত্র হইতে এই স্থানে কতকগুলি বচন উদ্ধার করিয়া কঠাবিক্রয়ের অশাস্ত্রীয়তা প্রদর্শন করেন।

বহু বিবাহ প্রথা নিরোধে রামমোহন

নারীজাতির কল্যাণ চিন্তা করিয়া রামমোহন রায় বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেন। তিনি শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় অধিগৃহ দারাস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, অন্ততঃ নহে। তিনি দেখাইয়াছেন যে,—শাস্ত্র অনুসারে পত্নী যদি হরাসক্তা, দৃষ্টিরতা, স্বামীর প্রতি বিদ্যেষিণী, হিংস্র-স্বভাবী, অন্ধনাশিনী, রোগগ্রস্থ হয়, তবে স্বামী দারাস্ত্রের গ্রহণ করিতে পারে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর, মুত্রবৎস। হইলে দশ বৎসর পরে এবং যদি কেবল কষ্টা সম্প্রতি হইতে থাকে তাহা হইলে এগারো বৎসর পর্যন্ত দেখিয়া তবে পুরুষ বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী হইতে হ্রাস করিতে পারে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে তাহার সম্ভব বিলম্ব অস্ত পত্নী গ্রহণ চলিবে না।
কোনও ব্যক্তি পত্নী বর্তমানে দারাস্ত গ্রহণ করিতে চাহিলে স্ত্রীর শাস্ত্র-বর্ণিত কোনও দোষ আছে তাহা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গ্রহণ করিতে পারিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় বিবাহ করিবার অনুমতি পাইবে নতুন পাইবে না, এইরূপ একটি নিয়ম গভর্নমেন্ট হইতে করিতে পারিলে ভাল হয়, এইরূপ অভিমত রামমোহন রায়ের প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

“Had a Magistrate or other public officer been authorised by the rulers of the Empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusation as the foregoing substantiated, the above might have been rendered effectual and the distress of female sex in Bengal and the number of suicides would have been necessarily very much reduced.”

বর্তমান যুগে নারীর নানা বিষয়ে সামাজিক অবস্থার বহুতর উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত রামমোহন-আকাঞ্জিত বহুবিবাহ প্রথা-নিরোধক আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

বিধবাদের দ্বিতীয় রামমোহন

রামমোহনের চিত্ত বিধবাদের দ্বিতেও কাঁদিয়াছিল। তাহাদের দ্বিতে দূর করিবার জন্য তাহার ননে যে-পরিকল্পনা জগিয়াছিল, তাহার ফলে সংবাদ কৌমুদীর বং সংখ্যায় বিধবাদের ভরণপোষণের জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত ইউরোপীয়দিগের জন্য যে “সিবিল অ্যাং মিলিটারী উইডোজ ফাগ” নামক ধনভাঙ্গার প্রতিষ্ঠিত হইতাছিল, তাহার অন্তর্গত একটি ধনভাঙ্গার প্রতিষ্ঠিত করিতে এ দেশের ধনীদিগকে আহ্বান করেন। সংবাদ
"An appeal to the wealthy Hindus of the Metropolis to take into their benevolent consideration the intolerable misery and distress in which a number of Hińḍoo widows are involved, in consequence of the destitute situation in which their deceased husbands have left them and to constitute a Society for their relief as well as for the benefit of future widows, under similar circumstances under the principle of the Civil and Military Widow Fund established by order of Government."

রামমোহন আইন পাশ করাইয়া। বিধবাদের অনুর চিন্তা হইতে যে কেবল উচ্চার করিয়াছিলেন তাহাই নহে; বৈধবরাপ্ত তাহাদের যে আর্থিক হুইন্দি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া তাহার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ একটি গঠনমূলক পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন।

বিধবা বিবাহের সমর্থনও যে তিনি করিতেন তাহ আম্বীয় সভার একটি বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। ১৮ই মে ১৮১৯ তারিখের এসিয়াটিক জার্নালে ইঙ্গিত গেজেট হইতে উল্লিখিত একটি বিবরণে এই সভার একটি অধিবেশনের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে—“এই সভায় বালবিধবাদের বাধ্যভাবূক বৈধব্যের বিরুদ্ধে, বহুবিবাহের ও সহমরণের তীব্র নিন্দাকরিয়া প্রকায় গৃহীত হয়।”

সত্তীদাহ নিবারণ আন্দোলনে যাহারা সেইখান হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত গৌরীশংকর তর্কবার্তার ও গুড়ুঝড়ে ভট্টাচার্য একজন প্রধান সভায় ছিলেন। তিনি তৎসম্পাদিত “সংবাদ ভাষ্কর”
লিখিতছিলেন যে সতীদাহ নিদর্শন, বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রভূতি সমাজ-হিতকর ব্যাপারে রামমোহনকে সম্পূর্ণ-সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া। তিনি কলিকাতা শহরে রামমোহনের আশ্রয় লাভ করেন। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে রামমোহন বিধবা বিবাহেরও পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই প্রথা প্রচলনে যত্ন লইবার তাহার বাসনা ছিল।

নারী-কল্যাণ-ক্ষেত্রে এই পুরোহিতের বহুবিধ নারী-কল্যাণ-প্রচেষ্টার পরিচয় এত বেশী যে, বোধহয় পুনিনী কোনও নারী-হিতৈষীর এত বিবিধ প্রকার চিন্তা দেখা যায় না। সেইজন্য রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে—

“রামমোহন রায় স্ত্রীজাতির সেরূপ উকীল ছিলেন, এমন বোধ হয় স্ববিধায় মিল সাধ্য ও নাহেন।”

নিজ পরিবারের মধ্যে যাহাতে বহু বিবাহ প্রচলিত না থাকিতে পারে সেইজন্য রামমোহন তাহার উইলে এই নির্দেশ দিয়াছেন যে যদি তাহার পুল্লুণ বা তাহাদের বংশধরের মধ্যে কেহ এক পত্নী বর্তমান থাকিতে পুনরায় দারান্ত্র প্রাপ্ত করে, তবে সে তাহার বিতর্কের ভাগ হইতে বঞ্চিত হইবে।
দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহন নেতার ও প্রাকৃতিক আগ্রহীয় যুগে

নারীকল্যাণ

রামমোহন দে কল্যাণ যুগের অঙ্গ করিয়া গেলেন তাহা তাহার তিরোভাবের পর মোকাবীল না থাকিলেও একেবারে নিভিয়া নাই। ডিরোজিওর শিক্ষা তখন বাংলার চিন্তাভঙ্গের নায়কের আসন আপনাদের সংব-শক্তির বলে দক্ষ করিয়া লইয়াছিলেন।

এই দলের তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককুঞ্জ মলিক, ও কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাহার সতীদাহ আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিরাপত্তা হইলে ইংলণ্ডে সতীপক্ষীয়ের আপনার যখন খারিজ হইয়া গেল, তখন ইংলণ্ডের কে তঞ্জন্ধ দণ্ডধারাদি দিবার ও রামমোহনের এই বিষয়ে অকৃষ্ঠ পরিশ্রমের সাথো তাহাকে প্রশংসা করিবার বজ্র বস্ত্র হয় তাহাতে কৃষমোহন বক্তা করেন ও রামমোহনের মৃত্যুর পর সনে প্রথম আরোপনত।

হয় তাহাতে রসিককুঞ্জ রামমোহনের নারীকল্যাণ বদ্ধ বিষয় উল্লেখ করেন। ইহারা তিনজন ব্যক্তি রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচার্জ মিত্র প্রভৃতি ইহাদের বদ্ধ রামমোহনের তিরোভাবের পর রামমোহনের শিশু পাঠ্য রামমোহন ও রামচন্দ্র বিশ্বাবসিদ্ধের প্রভাবে আসিয়া পড়েন।

আদাম সাহেব ইংলণ্ডে যে British Indian Society করেন, তাহার সহিত ইহাদের যোগ ছিল এবং ঐ সভার সদস্য জন্মে তমসনকে দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে লইয়া আসার পর যে Bengal British
India Society টমসনের প্রশ্নে স্বাভিঃ হয়, ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চার সদত দলভুক্ত ছিলেন।

বিধাবাবিবাহ সম্বন্ধে প্রথম পাত্তি

এই রেঙ্গল বুইটিই ইহার সোসাইটি বিধাবাবিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অবস্থানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র বিধাবাবিবাহের পোষকতা করিয়া শাস্ত্রীয় ভিন্নতে একটি অত্যন্ত উদার ব্যবস্থাপদ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বেঙ্গল হরকরা পত্রে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসের ১১ই তারিখে এই সম্পর্কে বলা হয় যে—

"The liberal Vivasthu which he recently gave regarding the remarriage of Hindu widow, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindu reformers."

রামগোপাল, তারাচাদ, পারীচাদ প্রভূতি ব্যক্ত এই সময়ে এ দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলন চালাইবার জন্য রামগোপালের সম্পাদকতায় "বেঙ্গল স্পেক্টের" নামে একটি পত্রিকা বাহির করিবার সংস্করণ করেন। রামগোপাল উচ্চার বন্ধু গোরসাদ বস্কিকে এ বিষয়ে যে পত্র লেখেন তাহাতে উক্ত পত্রিকা প্রচারের অগ্নে উদ্দেশ্য যে বিধাবা বিবাহের যোজিততা প্রদর্শন, তাহা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন।

পারীচাদ মিত্র, কিশোরচাদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভূতি মিলিয়া সমাজোপসাগর বিধাবাহিনী হন্দুদ সমিতি বালিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভাপতি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরী-

* Sannyal’s Life of Ram Gopal Ghosec-এর পরিশীলনে এই পাত্রটি আছে।
ঠাকুরের গৃহে এক সভায় কিশোরীচারদের প্রস্তাবে দিয়ে করেন যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনঃবিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন ও বহুবিবাহ রোধের জন্য সমিতির শক্তি বিশেষভাবে নিয়োগ করা হউক। মহব্বি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার সভাপতি ও কিশোরীচার মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারাীচার মিত্র, রামকৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিক্ষার প্রচেষ্টা এই সভার সদস্য ছিলেন।

এই সভার অন্ততম যুগ্ম উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ধারার প্রবন্ধ সর্বোচ্চ হইলে সাহায্যের পূর্বাপেক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দের রামগোপাল ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রবন্ধ রচনার জন্য মধুসূদন দত্ত প্রথম পুরস্কার ও ভূবনের মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

দানবীর মণ্ডিলাল শীল মহাশয় এই সময়ে ঘোষণা করেন যে কোনও হিন্দু ভ্রমণ যদি উৎসাহী হইয়া কোনও হিন্দু বিধবার পানি প্রস্তুত করেন তবে তিনি সেই ভ্রমণ ব্যক্তিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন।

ইহার পূর্বে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমেই মণ্ডিলাল শীল ভূমিকা নিয়োগ করে অন্তর্বা বিধবাদিগের জন্য প্রশিক্ষণাব ও সুবিধাত শিক্ষাদের জন্য আবাদ নির্মাণকল্প ডাক্তার ও সাগরগির সারফত সরকার হস্তে একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এই সংবাদটি ১২ই ফেব্রুয়ারীর হরকরা পত্র হইতে ১৮৪০ সালের মাসের এসিয়াটিক সার্বিকের উল্লিখিত হয়।

শীলশাসনাথ যোগ রচিত "কর্মরী কিশোরীচার" পৃষ্ঠা ৯৯
Sangbadit Eit—"Baboo Muttylal Seal has communicated through Dr. O'shaughnessy, to the government, his intention for expending a lac of rupees on the immediate establishment of an asylum for pregnant Hindu widows together with a foundling hospital and school." Vide Journal, Asiatic May, 1840—Asiatic Intelligence pp. 19.

প্রথম বিধবা বিবাহ সহায়ক সভা।

বৌবাজার অঞ্চলে কয়েকটি যুবকের চেষ্টা করেক সাহায্য উদার মতাবলম্বী পণ্ডিত এই সময়ে বিধবা বিবাহের সমর্থক হন এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা উক্ত কার্যে সহায্য করিলেন। করিবার উদ্যোগ লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বরের “হরকরা” পত্রে আছে যে—

"—A Society for the remarriage of Hindoo widow—We understand that some respectable youngmen at Bowbazar having associated themselves with some clever and liberal-minded Pandits of the country, have established a club for the purpose of consulting the ways and means for the marriage of Hindoo widow.

তত্ত্ববোধিনী সভার দান

বাংলাদেশে ডিরেকশিওর শিয়ালগঞ্জ, প্যাডাম ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাহীনদের সংস্পর্শে অসিয়া সমাজ সংস্কার কার্যে ও নারী কল্যাণ রতে এইভাবে যখন উৎসাহের সহিত কর্মে রত হইয়াছিলেন, তখন মহিলা দেবদার্শনের মনেও কর্মসাগরে কাপ দিবার ইচ্ছা জাগিত হয়। বিষয়-বাসনা হইতে
আপনার চিত্তকে সংযত করিয়া এই সময়ে দেবনাথনাথ রামনোহন-প্রচারিত ধর্মে আপন চিত্তকে রামচন্দ্র বিশ্বাসগীতের প্রভাবে ধীরে ধীরে অগ্রগতি করিয়া তুলিতেছিলেন ও “তথ্যন গ্রিন্টি ও তথ্য প্রিয়কার্য সাধনকে তত্ত্বাবধানে দীক্ষা লইয়া। রাৱ্যে, সামাজিক সাহিত্য ও ধর্মের দেবায় যাহাতে তাল ভাবে আধ্যাত্মিক সংহতি হয় তাহার জ্ঞান সঞ্জ গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেইদৃষ্টে রামচন্দ্র বিশ্বাসগীতের তত্ত্বাবধানে দেবনাথনাথ যে তত্ত্বাবধানী সাহিত্য নামক সঞ্জ গঠন করিলেন তাহাতে।

ডিরোজিও শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্জলের মূলক্ষেত্রের রামগোপাল ঘোষ, ভারতাদ চক্রবর্তী, রাধানাথ শিবদার, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাদ মিত্র প্রভৃতি এই সভায় বোধ দিলেন।

গোড়া হইতেই সেইসময় এই সভায় একটা বিশ্বাসী মনোভাব দেখা দেয়। ধর্মচক্র বিশ্বাসগীতের বিশ্বাস অন্তর এই বিশ্ববাদীদের ভাবে দাড়া দেয় এবং তিনিও তত্ত্বাবধানীর চায়তলে আসিয়া দূর্গাপ্রবাহ হন। এই মনিকাংশ যোগের ফলেই বিধা বিবাহ সমর্থন ব্যাপারটি রীতিমত আনোনলে পরিবর্তিত হইল ও বিশ্বাসগীতের বিশালচিত্র ও বিরাট মননশক্তি এই আনোনলকে এত শক্তিশালী করিয়া তুলিল যে পুরুষ হইতে জমি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও তাহাকেই বিধা বিবাহের জন্ম বলা যায়।

প্যারীচাদ, কিশোরীচাদ, রামগোপাল, রামচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বস্তুগুণ স্বীকার করিয়া তথ্যন গ্রেট প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু শাস্ত্রের জ্ঞান নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছেন। রামচন্দ্র আপনার ভাষা উপস্থিত রাধানাথ ও অন্যদায়ীকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন যে তাহার পরে নারী-সম্মিলিত স্থাপনা করিয়া বহু সংখ্যে নারী-শক্তির একটি করিতে সহায়তা করিয়াছেন।
অক্ষয়কুমার আবার নানাপ্রকার নারীকল্যাণ আন্দোলনের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখনী চালনা করিতে থাকেন। সরল বাংলা গল্পে নানা প্রকার জ্ঞানপ্রদায়ী ও চিন্তা উদ্দেশকারী প্রবন্ধ-সহারে তত্ত্ববোধিনী সমাজের ধারণা বাংলার সংবাদপত্র সহায়তা যুগান্তের আনিয়াছিল; এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত বলিয়া। অক্ষয়কুমারের সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রবন্ধগুলি এদেশে তুমুল আন্দোলন তুলে।

জর্জ্যাকেভের “Constitution of Man” পুস্তকের ভাব অবলম্বন করিয়া অক্ষয়কুমার “মানবের সহিত বাহ্য বস্তুর সমস্ত বিচার” করিয়া। যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন এবং যাহা ১৮৫২ সালের মাসে প্রকাশিত হয়, তাহা এদেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে। ইহাতে ভিন্নভাবে কিনা বিবাহের যৌনকাঠা, অন্যায় ব্যক্তির বিবাহের অকর্ষব্যতা, বহু বিবাহের কুফল, ক্রীলোকদের বিশালাক্ষশ্রুতির সম্পর্কে যে সমস্ত অথবা যুক্তি দেওয়া আছে তাহা পাঠ থাকে স্বাভাবিক মনয়ে চাটিমহলে গভীর আলোকন উঠে। ঢাকা জেলার কালীপাড়া গ্রামের শুলের ছাত্রগণ প্রতিক্ষা করেন যে—“এই পুস্তকে লিখিত বিবাহের নিয়ম প্রতিপালন করিব।” অন্যান্য স্থানের উল্লেখ না করিলেও এই একটি গ্রামের বিষয় উল্লেখ এই জন্য প্রয়োজন যে, তখন এই শুলের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখ করে “অবলা বাহ্য” নামে প্রসিদ্ধ নারীকল্যাণের দার্শনিক গোলপাড়ায় এই শুলের অন্ততম ছাত্র ছিলেন এবং অক্ষয়কুমারের পুস্তক পাঠের নারীকল্যাণকাঙ্ক্ষার অন্তর্ক্ষে তাহার মনে উঞ্চ হয়। দার্শনিক তত্ত্বের “নববাংলিকা”তে অক্ষয়কুমার সম্পন্ন লিখিয়াছেন যে—

“ইনিই এক প্রকাশ্রূপে বহুবিবাহ ও বাংলার বিবাহের অবৈধতা, বিপ্লবকাহার
৩০  বাংলার নারী-জাগরণ

ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্বকতা দেশীয়লোকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ... বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, এ পর্যায় আর কোন ব্যক্তি সেইরূপ পরিয়াছেন কি সন্দেহহৃদ।”

ধারকানাথ যে- অক্ষয়কুমারের লেখনী হইতেই প্রথম প্রেরণ লাভ করিয়া দিয়া অক্ষয়কুমারের জীবনী লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বানিধি মহাশয় ধারকানাথের নিকট হইতে শুনিয়া। অক্ষয়চন্দ্রের জীবনীতে অক্ষয়চন্দ্রের যুবক্ষুদ্রের উপর গ্রহণ করিয়া সময়কে আলোচনা কালে লিখিয়াছেন।

এই সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে তর্কবোধিনীর সংস্কারমূলক কার্য্য স্ত্রীপ্রাপ্তারী হইয়াছিল।
তৃতীয় অধ্যায়
বিদ্যাসাগরীয় যুগ

তত্ত্ববোধিতা তাহার কর্মে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান লইয়া ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে নহে। তাহার জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নতুন জীবনের স্পন্দন আনিয়া ছিলেন। এক এক জন দিক্পাল জীবনের এক একটি দিকে নতুন নতুন শক্তির সংগঠন করিতে ও বিপ্লবনীত পরিবর্তন আনিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষভাবে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান নিজের জীবনের সাধারণে বরণ করিয়া লইলেন। বিধবা বিবাহের সাধারণে তাহার প্রথম প্রকাশ ঘোষণা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মারাত্মকতায় ঘোষণা করিয়া প্রবৃত্ত হয়। ১৭৭৬ সালের ফাল্গুন মাসের (১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়—বিধবা বিবাহ প্রচারিত হওয়া উচিত কিনা—এই শিরোনাম বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশে প্রকাশিত হয় ও পরের বৎসর (১৭৭৭ শতক) (১৮৪৫ শতকের নভেম্বর) অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত পত্রিকায় “বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুইতার পুস্তকের উপক্রমভাগ” প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার চৈতন্যর (১৭৭৬ শতক) বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশে সংস্কার করিয়া প্রকাশ দেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রকাশে পত্রিকায় মারফৎ বিধবা বিবাহ সাধারণ করিবার বহু পুর্ব হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে আহবান করিয়া। সংস্কারকর দলের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন।
সর্বশুভকরী সভা

১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারীর মাসে ঠান্ডাওয়ার রামচন্দ্র চত্তরের বাড়ীতে কর্ণেল সমাজ-সংস্কারাত্মক “সর্বশুভকরী সভা” নামে একটি সভা সংগঠন করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল “যাহাতে দেশ প্রশিক্ষিত যে সমস্ত কৃষি ও কদাচিতের জন্য এ দেশের বিধান অনিষ্ঠা ঘটিয়েছে, এই সমস্ত কৃষি ও কদাচার চিরকালের নিমিত্ত হতাশ ও দুর্লভত হয় সাধারণদের তদন্ত যদি করা” এবং বিশেষভাবে “কোল ব্যবস্থা, বিধান বিবাহ প্রতিষ্ঠা, অন্য বসন্ত বিবাহ প্রকৃতি যে কত্তিপয় অভি বিষম অশেষ দোষকারক কুষ্টিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসময়ের নিরাকরণ করা।

এই সভার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সভা চতুর্থতে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাস “সর্বশুভকরী পত্রিকা” নামে একখানি পত্রিকা ও প্রকাশ করা আরম্ভ হয়। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শ্রীমতিসাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকিত; কিছু পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কলালচার। প্রথম সংখ্যায় “বল্লাবিবাহ দোষ” নামক প্রবন্ধটি ঈশ্বরচন্দ্রের লিখিত ও দ্বিতীয় সংখ্যায় “স্বাধীনতা” বিষয়ক প্রবন্ধটি মদনমোহন তর্কলালচারের রচিত। প্রবন্ধগুলি স্বাধীনতা না ছিলেও উহা যে তাহাদের রচনা তাহার বিদ্যাসাগরের ভাষা। শ্রুতচন্দ্র বিদ্যামর্দক তাহার “বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত” লিখিয়াছেন ও রাজনারাণ বন্ধ তাহার “আশ্চর্য”-এও বলিয়াছেন।

এই পত্রিকায় মদনায়ণ ও মানসাহারের বিকাশ চরিতন কলা হইত। সর্ব শুভকরী সভার “বীজ শ্রুত্রুপঞ্জ” ছিলেন স্বামী বিভেকানন্দের খুলন্তাত তারকা-

* সর্বশুভকরী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্প্রসার উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ বিবৃতি হইতে।
চতুর। ইনি তাত্বিক সত্য কনিষ্ঠ শিক্ষক নামে আচরণ করেন। তারা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর ছিলো। এই সমস্যাটিকে সত্যের অত্যধিক যুক্তি দেখানো ছিল, “বিধবা বিবাহ প্রকাশে” বিধি যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহ। জীবনকাল করিয়া। তাহার প্রতিকুলতা করিতে ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করিতে উদ্দেশ্য করা। কাজে কাজেই বলা যায় যে, এই সভার সম্পর্কেই ঐশ্বর্য চল্লেন বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রথম প্রয়াস দেখা যায়।

বিদ্যাসাগরের জীবনের উনিষ্টম ব্যত

বিধবা বিবাহ প্রচলন যে বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কায় ছিল, তাহ। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। ঐহার পত্র নালায়ণকুণ্ডের যখন বিধবা বিবাহ হয় (১৬ই আগস্ট, ১৮৭০) তখন হাতি শঙ্কুচরণে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে—

"বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সংক্ষেত্র, কথ্য ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সংক্ষেত্র করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ে সংক্ষেত্র করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাপ্ত স্বীকার করিব; পরামুখ নহি। আমি দেশচারীর নিকট দাস নহি, নিজের বা সমাজের মন্ডলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইতেক তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কিত হইব না।"

এই কথায়ে ব্যতীত হইয়া। তিনি মুক্তহৃদয়ে অর্থ ব্যয় করিতে থাকেন:

"নতুন অনন্ত দীর্ঘকাল মধ্যে শুভ মন্ত্র অবচেতন হইলেন। পাইকপাড়ার বাস্তবপ্রচেষ্টা সিংহ পরামর্শিতাভাগের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু তাহার তিনি স্বভাবিক ঐশ্বর্য বশতঃ অর্থাদাতা ইহাকে ১
বিশ্ব সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সাহায্য প্রাপ্ত সুবেদে ইংহারা প্রায় রাত্রিতে একটি আগ্নেয় হয়। বিনিময়ের আগ্রহ হইয়াছে গুরুত্ব অনেকে ইংহার সাহায্যের চাহি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কে অভিত্তিয়ে চারি সংগ্রহ হইতেছে, ইংহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, অনেকেই বিধবা বিবাহে কেনও প্রকার সহায়- সহিত নাই, কেবল ইংহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। ইংহারাই এইরূপ দান গ্রহণের সম্রদ হইলেন না। শুভ্রাঙ্গ সংবাদ- পত্রে সর্ব সাহায্যের কারণ বিভিন্ন বিভিন্ন বিবাহের সাহায্যের এক পোস্তা পর্যন্ত দান করিতে চাহেন, তাহাদিগের প্রাপ্ত অর্থ সাদরে গৃহিত হইবে। কিন্তু তাহারা আমাকে বিপদ ভাবিয়া আমার সাহায্যের নিমিত্ত চারি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া বিরত হইলেন, আমি নিজ দায় তার অনেক সাহায্যে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না।”

বিদ্যাসঙ্গর মহাশয় পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন হন নাই, ঐগুলি পুনর্বাসনে বাঙালিও হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন ও ১৮৫৫ পৃষ্ঠার ওপর অক্টোবর তারিখে উত্তরপাড়ার জয়নগর মুখ্যাতিতে প্রকাশিত একটি স্পেসিফিক ভারত সমাজের নিকট প্রবন্ধ করিয়া বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গতি করিয়া অনুপ্রাণ জাপন করেন।

এই আদেশের তহবিলের সংবাদ ভাষ্কর ও মাঝিক পত্রিকায় সম্ভাবনা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। ইংহার প্রবন্ধ আনন্দের ফলেই ১৮৫৬ পৃষ্ঠার ১২ই জুলাই বিধবা বিবাহের আইনসঙ্গত দিন বিবাহ দীক্ষামূলক আইন, ভারতের ব্যবস্থাপক সভার উপস্থিত হয় এবং

* নব্যাধিকার, পৃষ্ঠা ১৯২-২০০।
বিলের পাঁচটি পেশ করিয়া জন পিটার গ্রাম্ব বলেন যে, বিলের
সমর্থনে পাঁচ হাজার ব্যক্তি স্বাক্ষরকৃত পত্রচিট আপনি ও বিপক্ষে
পাঁচ হাজার ব্যক্তি স্বাক্ষরকৃত চূড়ান্ত আপনার পাওয়া গেলেও
সরকার পক্ষ এই বিলের মূল বিষয়টি সমর্থন যোগ্য বিচেনা। করেন, সেইজন্য
eই বিল পেশ করা হইল। বিভাগীয় শাসন কর্তাদের মধ্যে আগ্রা
প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই বিলের পূর্ণ সমর্থন জানিয়া ছিলেন;
বাংলা বোধহই প্রতির্থির শাসনকর্তৃ নীরব ছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই তারিখে উক্ত সনের ১৫ সংখ্যক
আইনের বলে বিধবা বিবাহ আইন গিদ্ধ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬শে
জুলাই তারিখে গভর্নর জেনারেলের অনুমতি লাভ করাতে আইনে
পরিণত হয়। ভারত সরকারের সেক্টরী নিদিদ বিভন সাধের
ব্যবস্থাপনা সভাকে জাপন করেন যে—

"The Governor General informs the legislative
Council that he has given ascent to the bill which was
passed by them on the 19th of July 1856 entitled bill to
remove all legal obstacles to the marriage of widows"

সামাজিক নিযোগন, বিদ্যাগত সত্যি বিচেন, শাসন প্রতির্থি
সত্যেই বিদ্যাগত আইনের সঙ্গে অটুট ছিলেন।

প্রথম বিধবা বিবাহ

আইন পাশ হইবার পাঁচ মাসের মধ্যেই আইন গিদ্ধ প্রথম বিধবা
বিবাহ হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের স্বীকৃত
শ্রীচন্দ্র বিদ্যারত ব্যাপারে বলে বিবাহ কালান্ত দেবাকে আইন সত্যভাবে বিবাহ
করেন।

ইহার বছর পূর্বে অবশ্য রাজা দক্ষিণারণ্য বর্ধমানের বিরহ।
বাংলার নারী-অগ্রগণ

রাগী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিয়া একাধারে বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-বিবাহে যে কেবল দেশচার বিরূপ ছিল তাহাই নহে, আইনত সিদ্ধ ছিল কিনা সন্দেহ। তখন বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আইন পাশ হয় নাই; কিন্তু কঙ্কনার্জন নিজ বিবাহ সিদ্ধ করিবার মানদেশ কলিকাতার ময়লাভেটের সম্বুচ্ছে এক দলিল সম্পাদন করিয়া। বসন্তকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের সাক্ষী হন গৌরীশ্বর তাক্নানী না। গৌরীশ্বর তাক্নানী ও ভাস্কর দ্বারক গুপ্ত। মনিলাল শীল বিবাহের পোষকতা করেন। পর জীবনে কঙ্কনার্জন বসন্তকুমারীর গর্ভস্থ নিজপত্র মনোঘনের যুক্তপ্রদেশের এক স্থানে জন্মে কর্তন সহিত বিবাহ দিয়া অন্ত:প্রাদেশিক বিবাহুপ সংক্রান্ত সাধন করেন।

দেবক্রান্তনের তত্ত্ববোধিনীর দল বিদ্যাসাগরের এই কার্য্যে সহায় হইলেন এবং উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দু পরিবারের বিধবা বিবাহ প্রচলন করিলেন। বিধবা বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া যোগিত হইবার পর, তৃষ্ণিতে ও চতুর্থ বিবাহ হয় রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়ের উদ্যোগে তাহার গৌণতাত্ত্বিক পুত্র গৌণনারায়ণ বস্তু ও ভার্তা মদনমোহন বস্তু। এই ব্যাপারে যখন রাজনারায়ণ আনীতরশ্চন কর্তৃক উৎপীড়িত হন, তখন মহীশ্বর দেবক্রান্ত রাজনারায়ণকে পত্র লিখিল সমর্থন করেন। অফ্রান্ডিমার দলতে রাজনারায়ণকে লেখেন যে—

"আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা বিবাহ সম্পাদনার্থে সচেতন আসেন কি না। আমাকে তাই যে সম্পাদন করিতে আলো করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আণীতরশ্চন করিতেও করিবেন না। জয়ো জয়েন।"

* প্রবন্ধ—১০১১ কাল্পন কাল।
বাংলার নারী-জাগ্রত

মহবী দেবেন্দ্রনাথ যে “সমাজ-উন্নতি-বিধায়নী সুষ্ঠুদ সমিতির” সভাপতি ছিলেন, সেই সমিতির অন্তঃস্থম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিধাবিবাহ সমর্থন। তাহা হইতেও বুঝা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ ও এই সংস্কারের পোষক ছিলেন।

বহুদারাস্ত্র নিরোধ-প্রচেষ্টা

বিদ্যাসাগর বহুদারাস্ত্র নিরোধ করিবার জন্ত ঐরূপ বিবাহ আইন বিচিত্র করিতে সরকারকে একবার ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর ও পুনর্কার ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে অনুরোধ করিতে বিকল্প হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর বর্ধমান-রাজ মহাতাপটাদ এইরূপ আইন পাশ করিয়া সরকারকে অনুরোধ জাপন করেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আকাঙ্খিত এই স্তম্ভ সামাজিক বিধান আজও আইন-গ্রাহ হয় নাই।

সরকারের সাহায্যে বঞ্চিত হইল। জনমত গঠনের জন্ত তিনি পুষ্টক রচনা করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই বহু-বিবাহের বিচিত্র প্রথম পুস্তক ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। আইনের সাহায্যে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও জনমতের চাপে যে বহু-বিবাহ বিরল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ধর্মকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রচেষ্টার ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর এইদিকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের জন্তে যথেষ্ট শ্রম সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। বিটন সাহেব (ওচ্ছালিত নাম বেচুন) যখন স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করে বিটন খুলের প্রতিষ্ঠা করেন; তখন বিদ্যাসাগর তীব্র সহায়
The three natives to whom I desire specially to record my gratitude for their assistance are Baboo Ram Gopal Ghose, the well-known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me my first pupils, Baboo Dakshina Ranjan Mookerjee, a zamindar, who was previously unknown to me, but who as soon as my design was published, introduced himself to me for the purpose of offering me the free gift of a site for the school or five bighas of land valued at 10,000 Rupees in the native quarter of the town and Pandit Madan Mohon Turkalankar, one of the pandits of the Sanskrit College, who not only sent his two daughters to the school but has continued to attend it daily to give gratuitous instruction to the children in Bengali and has compiled Bengali Books expressly for their use.*

* Richey—"Selection from Educational Records" pt II 1840-57 pp 52-53
বাসিগণ তাহাকে সমাজচুক্তি করেন। বাশবন্ধুর হরদেব চতুরপাধ্যায় এই সময়ে আপন কষায়কে ক্ষুদ্র ঘোড়া করেন। উভয়কে হরদেব বাবুর হই কষায় সাহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হই পুত্রের বিবাহ হয়।

মহর্ষির নিজকা সৌদামিনীকেও বেথুনবিশ্বালয়ে প্রেরণ করেন। ১৮৫১ জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে রাজ্যরাজ্যের বংশোদ্ভুত এক গল্পে লেখেন যে, “আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিশ্বালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখিএ দূর্ঘটনা কি ফল হয়?”

১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বহ স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাংলার একাধারে প্রতিষ্ঠা প্রচলনের সহায়ক হন। গ্রাম, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীর জেলাতে এই সকল স্কুল স্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহার চেষ্টাতে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদিগের ভরণপোষণ ব্যবস্থার কথা সম্পর্কে করিয়া “Hindu Family Anuity Fund” প্রতিষ্ঠা করেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাহার পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা

বিদ্যাসাগর যে সময়ে এই সমস্ত কার্য বোধ হইলেন না। তাহার পরিবারের মহিলাদের তিনি অন্তঃপুরে যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা কালে বহ ফলদায়ক হইয়াছিল।

মহর্ষিদেব যে মহিলাদের বিক্ষিত শিক্ষা দিবারও পক্ষাবলী ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার বিহিলী কষার স্বর্ণকূলী দেবী “পৃথিবী” নামক পুনর্বাচন করিয়া গুহে যেই রূপ বিভিন্ন বিয়ন্ত্র জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।
বাংলার নারী-জাগরণ

নারীগণের সাহিত্য-চর্চার অধিকারও দেবেন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করিতেন বলিয়া পুর্বের খ্রিস্টানদিনী ও কষ্ট প্রণুকুমারীর “বালক ও ভারতী” ও “বালক” পত্রিকা পরিচালনে সংগ্রহ থাকা সমুদ্রবর হইয়াছিল। প্রণুকুমারী ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে “দীপ নির্ভার” নামক একটি উপন্যাস ও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে “পৃথিবী” নামে একটি বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার আরও বহু স্থায়ী উপন্যাস ছোট গল্প কলাত্মক প্রভূতির পুস্তক আছে; লেখিকার হিসাবে তাহার স্নান বঙ্গ সাহিত্যে অত্যন্ত উচ্চে।

উন্মত্তকালে দেবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতেই উক্ত পরিবারের হিসাবে, সরল ও ইন্দিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার স্থায়ী লাভ করিয়া উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে এর প্রথমবারই আপনাদের স্নান করিয়া লইতে পরিয়াছিলেন।

বাংলার বাহিরে স্ত্রী-শিক্ষা

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ (বর্তমান যুক্তপ্রদেশ) স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ঠাকুর কল্যাণ সিনহু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্গালসরণ করিয়া কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহার কার্যে সত্তী হইয়া ভারতের সেক্রেটারী অফ হেট ১৮৬৪ স্কুলদের বন্ধ ডিপ্যাচে তাহার কার্যের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

বোধহই অঞ্চলে সর্ব একাদশ মুক্ত-আন্দোলনের অগ্রত্ব নৌরাজি কর্দমনাম মহাশয় তাহার ছাত্র সোয়ারবজি সাপুড়কি, দাদাভাই নৌরাজি, বি, এম, মান্নানিক প্রভূতির সহায়তায় “ইয়ম-বহি” দল গঠন করিয়া যে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার অন্তর্গত উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষা-বিষয়। তিনি “পার্শ্বী গাল্স স্কুল আন্দোলনেশন” নামক এক সভা স্থাপন করেন। সোয়ারবজি বাঙালী “পার্শ্বী গাল্স স্কুল” সভার স্কুলগুলিখাপনে ফাদু নজির সহায়তা। করা ভিন, নিজ প্রচেষ্টায় বোধহই প্রদেশে চারিটি ও নৌকারিতে
“একটি স্কুল স্থাপন করেন।” ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংহারা ‘স্নীহোদ’ নামে নারী কল্যাণকর একটি পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে স্নীহোদ দিগের জন্য উচ্চতর শিক্ষার আণ্ডালুন আরম্ভ করেন মিনস্ত্রোক্সিলের সৌম্যতা। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় “বিশ্বকোষের হাই স্কুল ফর ফিমেলস” স্থাপন করিয়া স্নীহোদ প্রসাদে যজ্ঞবল্তী হন।

বিদ্যাসাগরের প্রভাবের বিস্তার

বিদ্যাসাগরের সংস্কার-যুগের আরম্ভের সময়েই বাঙালির আর এক শক্তিশালী পূর্ববঙ্গের সাধারণের দেবেশ্বরমন্ত্রের সঙ্গে যোগদান করেন। ইংহার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত নারীকল্যাণ-কার্যে পরে বিশ্ব ভাবে আলোচনা করা নাচিবে। এইখানে এই উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, তিনি যখন ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রচারে ভারতের সংস্কার অপরে ব্যাপার হন, তখন মানবের সংস্কারী মুক্তিক আদর্শ তিনি নগরে নগরে এমন ভাবে প্রচার করেন যে তাহার ফলে বৌদ্ধাঙ্ক মাধ্যমে ভ্রমণিতে অধিক বিভিন্ন জনহিতকর কাহিনী মাধ্যমে মাধ্যমিক উঠে এবং তাহার একটি ফলবর্ধন নারীকল্যাণ-কার্যে বৌদ্ধাঙ্ক আহমদাবাদ মাধ্যমে ভ্রমণিতে অধিক বৈশ্বিক উঠে।

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ইতিহাসে একটি স্রোতীয় বর্ষণ। ’এই বৎসর কেশবচন্দ্র প্রথম পূর্ববঙ্গ এবং পরে বৌদ্ধাঙ্ক ও মাধ্যমে গমন করিয়া সমাজ-সংস্কার অণুসন্ধানকে ঐ সব অঞ্চলে চড়াইয়া দেন।

কেশবচন্দ্রের অমিতমূর্তা বক্তা। অধ্যায়ে সর্বদৃষ্ট যুবকদের মনে সমাজ-সংস্কারের প্রথা জাগিয়া উঠে। সেই বিরাট প্রচেষ্টার বিবরণ পরে বিরত হইবে। এইখানে এই বলিলে বর্ণের হইবে যে, ঢাকায় নবকাল চট্টগ্রাম, সারসাঙ্গ, ও বরকাল হালদার প্রভূতি যুবকদের বিধবা বিবাহ প্রদান ও কুলীন কম্পতির উচ্ছার করিয়া আনিয়া তাহাদের সংস্কার সাল্যত করার কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন; বরিশালে তর্কামোহন দাস বিধবাদের
ঘৃঠমোচনের জন্য আশ্রয় দান ও বিবাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং নিজ বাড়ীতে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন না করিয়া অন্যত্র সেই চেষ্টা করা সঙ্গত নহে বলিয়া আপনার বালবিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়া নানা প্রকার সামাজিক নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত বদনে সন্ত্রাস করিতে লাগিলেন।

বোধহই প্রদেশে আন্দোলনের পাঁচ তারিখ ও বাস্তুদিব বাবুজি নৌরাজ্জীর নেতৃত্বে বোধহই-এর পরবর্তী পবিত্র বিবাহ প্রচলন, বাবু বিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রস্তুতি কার্যে মনোনিবেশ করিলেন: ঐ বৎসরই বিধু পরগণার শাস্ত্রী “বিধবা বিবাহ” পুষ্টকের মহারাজের ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খৃঃ প্রাঙ্গণে বাস্তুদিব বাবুজি নৌরাজ্জী নিজেই কৃষ্ণাবাসী নারী এক বালবিধবাকে বিবাহ করিয়া বোধহই অঞ্চলে প্রথম বিধবা বিবাহ কার্য্য প্রবর্তন করিলেন।

মান্ধান প্রদেশে যে আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিল তাহার ফলে ১৮৭১ খৃঃ প্রাঙ্গণে কাশীবিখ্যাত মুদেলিয়ার “শ্রদ্ধনাটক” নামক এক নাটক রচনা করিয়া বিধবা বিবাহ ও নারীবাদীর শিক্ষার সমর্থন করিলেন ও “শ্রদ্ধা দীপিকা” নামক এক পত্রিকা বাহির করিয়া আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিলেন। এই আন্দোলন বীরেশ্বরিণী পাঁচ গুরু স্মরণ করিয়া অঞ্চলে বিবাহ করিয়া তুলিলেন যে, তুলনায় ঐ অঞ্চলে ‘বিদ্যাসাগর’ বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৭৯ খৃঃ প্রাঙ্গণে, বীরেশ্বরিণী রাজস্থানী সহরে বিধবা বিবাহ সমন্বিত গঠন করেন ও বীরেশ্বরী বিধবা বিবাহ সমষ্টি শাস্ত্রীর মধ্যে বিবাহ পর্যালোচনা করিয়া বিদ্যাসাগর রাজস্থানীর সহরের সঙ্কীর্ণ তেলেগু ভাষার পরিচয় করাইয়া দেন।
চতুর্থ অধ্যায়

কেশবচন্দ্রের যুগ

দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মারফত এই দিনে অবল আনুষ্ঠানিক তুলিয়াছেন, তখন ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক কিশোর কেশবচন্দ্র আদিশী। এই দলে যোগ দেওয়াতে সংস্কার-বাদ্য দলের শক্তি অভাবে ব্যাপার চলাচল করতে। লোকের প্রতিভা, অপূর্ব বাংলা এবং আশ্চর্য কর্মশক্তিসম্পর্কে এই তরুণ কর্মচরকে নামিতেই আনুষ্ঠানিক পত্রিকা প্রকল্পে তুলি উঠিয়ে দিলেন।

“গুড-উইল ফ্রেটারনিটি”

কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্বেই কয়েকটি আধুনিক ও বস্থার সহায়তায় “গুড-উইল ফ্রেটারনিটি” নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া কলকাতায় কর্মচারী অবশ্যই হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পরেই এই ফ্রেটারনিটির সভায় কিশোর তিনি তাবাদোরের উপর সচিব মহাশয়ের রচিত বিধবা বিবাহ সমর্থক নাটক “বিধবা বিবাহ নাটক” অভিনয় করেন। কেশবচন্দ্র ও প্রভাপচন্দ্র মন্দীরের অভিনয় অভ্যস্ত মুদ্রার হওয়াতে এই নাটক শ্রদ্ধালুদের হয়ে ম্যান্ডল করে ও বিধবা বিবাহের সমর্থনে অমূল্য হয়ে ভাগ্নে করে। কেশবচন্দ্র “Young Bengal, this is for you” নামক এক বক্তৃতা-সম্পাদক সাহায্যে বাংলার তরুণদলকে মাতাবাটি তুলিয়েন ও “ইংরিজিতে মিরার পত্রিকায়”র প্রথম
লিখিত চৌকিনীত সংকার আন্দোলন তুলিলেন। মিরারের যুগ-সম্পাদক মনোমোহন ঘোষ ১৮৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববর্তী যে অবিনিষ্ট দাসী প্রথা তখনও প্রচলিত ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তীর্থ আক্রমণ চালাইতে থাকেন।

মহিলাদিগের সভার আরম্ভ—ভাগলপুর

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে কেশব প্রবর্তিত ঘননিবিষ্ট বন্ধু-সভা “সঙ্গত সভা” অসুর্বন বিবাহের সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন ও ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল তারিখে তারকনাথ দত্তের সম্পাদকত্বে ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপন করিলেন। তারকনাথ ইতিপূর্বেই ‘সর্বগণভক্তিমণি’ সভার তীর্থশ্রুত থাকিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিদ্বানবিবাহ সমর্থন প্রভৃতি নানা নারীহিতাধিক-কার্যে নিপুণ হইয়া এই দারীরহস্য পদে আপনার যোগ্যতা পূর্বকই প্রতিপল করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মবন্ধু সভা, জেনারাল-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও অন্তঃপুরস্ত নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়া বেশ সফলতা অর্জন করেন। কেশবচন্দ্রের এই আন্দোলনের পূর্বকই ভাগলপুরের ব্রাহ্ম যুবকদের রামমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাবে বজ্রশিয়ার বন্ধু ও অভয়চরণ মলিকের নেতৃত্বে নারীমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন ও ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমেই এই দেশের প্রথম নারী-সভা ভাগলপুর মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বন্ধুর জায়গাত ভারতীর ক্ষুদ্র ঘোষ (অর্থাৎ তার বংশের পিতা) ভাগলপুরে আগমন করিলে ভাগলপুরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের গতি তাহার উন্নতি অতাংস বাড়িয়া উঠিল। মিশ কোলেট ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে রাজ্য ইয়ার বুকের ৮২ পৃষ্ঠায় এসবকে লিখিয়াছেন—

"After Babu Krishnadhan Ghose had joined the
(Bhagulpur Brahmo) Samaj, it received a strong impetus to work social reforms. This was directed mainly towards the improvement of the conditions of our women........ There was a Brahmica Samaj, which was regularly attended by the ladies. No efforts were spared to train up the Brahmicas to habits of freedom and to high ideas of religious, moral and social life. The Brahmos also exerted themselves in educating the ladies to enable them to mix respectfully in social intercourse........

In fact, such was the attention paid by the Bhagalpur Brahmos to the improvement of the ladies, that in some quarters their actions were made the subject of unfavourable remarks by other Brahmos who could not properly appreciate them.

১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রদত্ত ধারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক বক্তৃতা হইতে জানা যায়—

"Long before the Brahmica Samaj of Calcutta, similar Samaj was established at Barisal and Bhagalpore. K.C. Sen instead of being the actual leader was led by his young friends. [Brahmo Public Opinion, May 1, 1879]

ভাগলপুরের ব্রাহ্মবন্ধু দলের এই প্রচেষ্টা সমাজ কল্যাণকর বিলিয়া কেশবচন্দ্রের বোধ হওয়াতে এই আন্দোলন ভারতময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতে তিনি সক্ষর করেন এবং তীব্রই প্রায়োগিক প্রচেষ্টারূপে ব্রাহ্মবন্ধু সভার কার্য ক্রম বিরূপত হয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা

ব্রাহ্মবন্ধু সভার উৎসাহী সদস্য উমেশচন্দ্র দত্ত ( পরে সিট কলেজের অধ্যক্ষ, সাধুতার জন্ম প্রসিদ্ধ সাধু উমেশচন্দ্র ) মহিলাদের জন্ম বামাবোধিনী
বাংলার নারী-জাগরণ

পত্রিকার নামে পত্রিকা ১৮৬৪ খ্রীঃপূর্বে বামাবোধিনী সভার পক্ষ হইতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। এই পত্রিকায় এই দিকের মহিলাদের বাঙ্গ সাহিত্যের সাহায্যে সংগঠন চাতক ভাবে আরম্ভ হয় ও মহিলারা। প্রথম লেখক। হইবার সুরিদী অর্জন করেন। সৈকত বামাবোধিনী পত্রিকার প্রচার-আরোপের নারীকলাণ-যশের একটি নবপুরের ভারত বলা যায়। ইহার পূর্বে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য ”মাসিক পত্রিকা” নামে। একটি মাসিক পত্র ১৮৫৮ খ্রীঃপূর্বে আগুন মাস হইতে প্রথমার্ধ মিত্র ও রাধানাথ শিক্ষার সম্পাদকভাবে বাহির হইয়াছিল কিন্তু তাহা মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলেও মহিলাদের লেখা। ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। বামাবোধিনী পত্রিকার বিশেষত এই যে, ইহাতে মহিলা লেখিকাও রচাত্মক বিশেষ স্থান পাইয়াছিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা মহিলাগণের সাহিত্য-সাধনার ব্রতী করিবার জন্য রীতিমত চেষ্টা করে। উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যার এই বিভাগটিই এইরূপ প্রচেষ্টার প্রথম।

বি আ পন

“বামাবোধিনী সভাতে ক্রান্তোকারের লেখা সমাদরপূর্বক গুরুত্ব হইবে এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট বা স্ব নাম ধাম। সম্বন্ধিত পত্র প্রেরণ করিবেন।”

বামাবোধিনী সভা হইতে মহিলা লেখিকাগণকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। বামাবোধিনী পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষের মাস-সংখ্যায় দেধায়। কুলের লেখিকাগণকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা থাকিলেও অন্য ব্যবস্থা না।
খাকায় নেই অভাব দূরীকরণের জন্য প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। কলিয়া
সর্কারের প্রবন্ধ রচয়িতাকে পুরস্কার দান ও পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশের
ব্যবস্থা করিয়া। বিজ্ঞাপন বাংলা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বিচারের ভার
দারকানাথ, বিদ্যাভূষণ, প্যারাইচর, মিত্র ও কেশবচন্দ্র সেনের উপর অগ্রিম
হইয়াছিল। এই সমস্ত হইতে নারীদেরের রচিত উৎকৃষ্ট রচনাগুলি
“বাংলারচরণাবলী” নামে পুস্তকাকারে বাংলার করা হইত। তাহাই হইতে
অনেক লিখিত হৃদয় প্রাপ্ত হুই ও উত্তরকালে সুলোচিত হুই পরিচিত হুই।

পূর্ববঙ্গে নারী-আন্দোলন

আন্দোলনের চেত পূর্ববঙ্গের ঢাকা ও বরিশালে পৌঁছাইলে অভাব
প্রবল হইয়া উঠে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ বরিশালে এই
আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন দুর্গামোহন দাশ ও লাখুটিয়ার জমিদার
রাকালচন্দ্র রায়।

রামভূষণ লাহিড়ী মহাশয় সেই সময়ে বরিশালে শিক্ষকতা
করিতেছিলেন; দুর্গামোহন ও রাকালচন্দ্র তাহার প্রভাবেই নারীকল্যাণ
কল্পে ব্যক্তি হয়েন। ঐহাদের মনে যে বৈদেশিক কর্ষণপথ ভাগে তাহাতে এই
ব্যতীত ইহারা অবতীর্ণ হওয়া পরেই যে সমস্ত সতি অগ্রগণ্য কার্য্য
আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সহ করা সংস্কার দলের পক্ষে করিয়া হইয়া
উঠে। দুর্গামোহন যখনই বিধবা বিবাহের যৌন্তনকতা উপলব্ধি করিয়ানে,
তখনই আপনার বলবিধবা বিভাগের বিবাহ না দিল এই সংস্কার কার্য্যে
ব্যবস্থা করা। তৃতীয় পক্ষে উচিত হইবে না বোধ অভাব সাহিত্যকর্তার
সহিত বিভাগের বিবাহের উদ্দেশ্য হইয়া উঠেন ও বরিশালের এক বৈদ্য
বংশোদ্ভূত তরুণ চিকিৎসকের সহিত আপন বিমাতার বিবাহ দিলেন।
বাংলার নারী-ভাগ্নেণ

এদিকে ঢাকার এক তরুণ যুবক পার্বতীচরণ দাসগুপ্ত ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ২য় আগষ্ট গুরুচরণ দাস নামক এক বৈষ্ণব কাজিনী নারী এক বিধবা কল্লার পার্বতীচরণ করিয়া একাধারে বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ করিয়া সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে তীর্থ করিয়া তুলেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার একটি রক্ষণশীল মনোভাবসম্পদ ছিলেন হুসাইন দার্জীওহান বাবুর ও পার্বতীচরণের এই ‘অন্তি অগ্নিস্র’ সংস্কারে তীর্থ হইয়া এই সব কার্যের প্রতিবাদ করিলেন এই বলিয়া যে, এত ফ্রান্সভাবে অগ্নিস্র হইলে সমাজে যে বিক্ষোভ চাপিতে ভাঙাতে সংস্কার কার্য্য পশ্চাৎ হইয়া যাইবে; তৈমূরীসাধক কর্ম্মপীড়া গ্রহণ না করিয়া ধীর মন্ত্রার সমস্ত সংস্কার কার্য্যে বৃত্ত হউয়াই যে বান্দ্রা দৃষ্টিসম্পর্ক সংস্কারকের পক্ষে উল্লেখ, এই মত ইহারা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

কাপোর্টারের ভারত আগমনে আন্দোলনের শঠ্য রূপহ

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতত্ত্বত্ত্বীয় ও নারীকল্যাণব্রতী মহিলা মিস মেরী কাপোর্টার এই দেশে আগমন করেন ও তীহাকে সংহ করিয়া কেশবচন্দ্র পূর্ববাঙ্গালা, মাধ্যাঙ্গ ও বোধিশপ এতেশে পরিভ্রমণ করেন।

কাপোর্টার মাধ্যাঙ্গ শহরে নারীশিক্ষা সমাজে বক্ততায় বলিয়াছেন যে, ভারতের নারীদের সেবানাটে বৃত্ত হইতে তিনি—রামমোহন রায়, সতোজ্ঞানান্থ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষের নিকট অমৃতানন্দ লাভ করিয়া ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতায় মিস কাপোর্টারের অভ্যর্থনার জন্য যে মহিলাদের আগমন হইয়াছিল, সেই মহিলাদের গুরুচরণ মহালতবিশ অনুপ্র

* Vide Address to the Hindus delivered in India Longmans 1867 pp. 48.
কর্ণক্রমে তরুণ যাপন আপন আপন পত্নীরের সহিত নিজ বন্ধুদের একাধারে আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার কর্ণক্রম পূর্বে বরিষালে রাখাল রায় মহাশয় তাহার পত্নীকে লইয়া তথাকার এক উচ্চপদস্ত ইংরেজ কর্ণচারী বাড়ীতে নৈশ আহারে গিয়াছিলেন ও শুভচরণ মহলানবিশের দল কলিকাতার একাধার রাঙ্গায় নিজ নিজ পত্নীদের সঙ্গে লইয়া পড়াইতে ভরণে বাড়ির হইতেন। বাঙালী মহিলাদের তখনকার পরিচ্ছদ প্রকাশে রাজবাড়ি হইবার উপযোগী ছিল না। বলিয়া তাহারা বিলাতী গাউনের উপর আঁচলা জুড়িয়া আঁধ বিলাতী আঁধ দেশী একপ্রকার ‘ঝেগনিংচুড়ি’ পরিচ্ছদ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোধহই প্রদেশে ব্যবহৃত পাষা শাড়ী রকমকের করিয়া বেশ শাড়ী পরিধান পথে অভিনব বাংলার নারীমাঝের পরিচ্ছদ হইয়া ঢাকাইয়াছে, সেই পরিচ্ছদ ইহার কর্ণক বৎসর পর আবিষ্কার করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পাঠ্য জ্ঞানদানসম্পন্নী দেবী। তাহার বোঝাই প্রবাদকলে ও ঠাকুর পরিবারের চেষ্টাতেই উহা বাংলাদেশে প্রথম চল হয়।

রাখালচন্দ্র ও শুভচরণের এই অতিঃ অগ্রসর সংঘার কেশবচন্দ্রের পুকুরমত হয় নাই এবং তিনি ‘মিরি’ পত্রিকায়—এই সময় অতি উৎসাহ হইলেন হয় না—বলিয়া ইহাদের মৃদু ভিন্নক্ষ পুর্বক্ষর পর্যন্ত করেন।

কেশবচন্দ্রের ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের মাত্র সংঘার, সমাজ সংঘার কার্যকে কন্দর আগাইয়। দিয়াছিল, তাহা পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই, কেশবচন্দ্র মহিলাদের জন্য “বাস্তিকা সমাজ” নামক সহা স্থাপন করিয়া। মহিলাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ, ভর্ক্স প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
সম্প্রদান প্রথার বিরোধিতা

এদিকে পার্সাঙ্কার বিবাহ ভিন্ন, কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত অন্তর্ভুক্ত অংশীত্র শিষ্য প্রসন্নকুমার সেন সহাইয়ে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মৈত্র নারী এক ব্রাহ্মণকন্যাকে ব্রাহ্মণপন্থী অন্তর্ভুক্ত বিবাহের বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণকন্যায় বর্ণণশীল দল অস্বর্ণ বিবাহ পর্যালোচনা করিতেন না; তাহারা—এই সমস্ত বিবাহ আইনত নিষ্কর্তি কি না—প্রথম তুলনা ভারতের আয়তনকে জেনারেল টি, এইচ, কওয়ে (T. H. Cowie) অভিমত প্রদান করেন বেল উহা নিষ্কর্তি নহে। কেশবচন্দ্র অস্বর্ণ বিবাহ প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন; সেজন্য এরূপ বিবাহ আইনসিদ্ধ করিবার জন্য, বিশেষ বিবাহ-বিধি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন তুলিয়েন।

প্রসন্ন কুমার সেনের বিবাহ আর একটি বিশেষ ঘটনার জন্য চরমবর্ণীয় হইয়া থাকিবে। এই বিবাহেই সর্বপ্রথম সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ধর্ম, অর্থ ও কাম পরম্পরকে অতিক্রম ন করিবার বর ও বধুর পরম্পরের বিবাহ-প্রতিক্ষী প্রবর্তিত হইয়া বধুকে দান সামগ্রী হইতে সম্বন্ধ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

ব্রাহ্মবিবাহ বিল আন্দোলন

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, কেশবচন্দ্রের আহ্বানে ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ গুরুত্ব করিবার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন প্রেরণের সংগ্রহ গ্রহণ করেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর, সিইন সাহেব “The Native Marriage Bill” নামে একটি বিল, আইন-সভায় উপস্থিত করিয়া এরূপ বিবাহ আইনতঃ নিষ্কর্তি করিতে চাহেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা
সফল হয় না। “ব্রাহ্মণসমাজ খুব দৃঢ়প্রতিষ্ঠা ও কুলংশ নেহ”, এই আপত্তিতে ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন সেবার সফল হইল না। দেশে যখন এই প্রকারে নারী-আন্দোলন চালিতেছিল, সেই সময়ে কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে, ইংল্যান্ডে গমন করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে, ইংল্যান্ড হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া “Social Reform Association” নামক সভা স্থাপন করিয়া এদেশে স্থলভ সংবাদ পত্র “স্থলভ সমাচার”, নৈশ বিদ্যালয়, অষ্টক্ষেত্রী বিদ্যালয়, নারীশিক্ষা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণকর কার্যের স্থান করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে এদেশে দূর্বলমোহন, গুরুচরণ, আল্পা খাঁসির, রাকিল চক্রবৰ্ত্তি রায়ের সহিত বিক্রমপুর হইতে আগত “অবলাদার” দ্বারস্থের সমোচ হটাতে, ‘অতি অগ্রসর নারীপ্রগতির সমর্থক দল এত শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে, নারী-আন্দোলন রাজধানী প্রতিষ্ঠানে আসিয়া আর একটি নব্যগতির স্থলন করে। তবুও কেশবচন্দ্র এদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া এমন দুইটি কীর্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন যে, রাজার নাম নারী-কল্যাণপ্রচেষ্টা হিসাবে চিরকালীন হইয়া থাকিয়া।

কেশবচন্দ্র এদেশে আইনসভা ব্রাহ্ম-বিবাহ সিদ্ধ করিবার আন্দোলন আরম্ভ করিতে মনস্থ করেন এবং তৎক্ষণ নারীর সর্বনিঃসরম বিবাহের বয়স গ্রহণ করিবার জন্য এদেশের চিকিৎসকগণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া হইয়া থাকিয়া। রাজার সাকুল্যের উত্তরে ডাক্তার চক্রুপাশার দে ও ডাক্তার চার্লস-উইলার কুতুদেশ বৎসর ; সন্তানবার, পঞ্চদশ বৎসর ; তামিনাদুনি, মহেশ্বরীলাল সরকার ও গুরুভাস চক্রবর্তী—বোধিশ বৎসর ও ভোজাই এদেশের প্রেমিক সম্ভারক ডাক্তার আমরান্ত পাঁচুক বিবাহ বৎসর বলিয়া অভিমত প্রদান করেন। লোকবাণ্ডা ধারাতে বলেন না ইহ সেই অভিমত চিকিৎসকগণ সর্ব নিরভর বয়স বলিয়া যে অভিমত প্রদান করিয়াছেন,
তাহাকেই, অর্থাৎ চতুর্দশ বৎসর সর্ব নিম্নতম বিবাহের কাল বলিয়া এই গুলি করিয়া, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-বিবাহ অনুষ্ঠান কার্যকারিতা নির্দেশ প্রদান করেন। যহার চেষ্টায় আইন-চিন্তার স্তর জেমস ফিউজেন টিফেন আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিল আনন্দ করেন, কিন্তু নবগোপাল মিত্র প্রস্তু রক্ষণশীল আদি-ব্রাহ্মসমাজ-নায়কদের বিরোধিতায় 'ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল' রূপে উঠা গৃহীত না হইয়া 'বিশেষ বিবাহ বিল' রূপে গৃহীত হয়। এই আইন অনুশীলনে বিবাহ সিদ্ধ করিতে হইলে সর্বনিম্নতম বয়স—কষ্টার চতুর্দশ বৎসর ও পুরুষের অষ্টাদশ বৎসর হওয়ার প্রয়োজন এবং প্রাপ্ত বরসের (অর্থাৎ একবিংশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর) নিজ অভিমত ও তরিকা বরসের অভিভাবকের মত প্রয়োজন। এই বিবাহে বিচ্ছেদ-বিধি (ভাইটোস) থাকার নারীজাতি আর একটি অধিকার লাভ করে।

কেশবচন্দ্রের নারীক্লায়ণ-যজ্ঞ এইরূপে সফলতা লাভ করিয়া চিরন্তনীতির হইয়াছে।

গুজরাটের কর্মীর মূলনীতি

এই যুগে বোধহই প্রদেশের একজন সমাজসংস্থারও তাহার কর্ম-প্রচেষ্টার জন্য নারী-কল্যাণ ইতিহাসে চিরন্তনীয় হইয়া পাকিয়া—ইনি প্রসিদ্ধ গুজরাটি সমাজসংস্থারক কর্মনীদার মূলনীতি।

ইনি "সত্যপ্রকাশক" নামক পত্রিকা বাহির করিয়া নানা সমাজসংস্থার-মূলক কাষ্ঠে যখন লিখিত ছিলেন, তখন ভাটিয়া ও বেনিয়া সমাজের এক কুৎসিত প্রথা নিবারণ করা প্রয়োজন অনুভব করেন,—তাহা হইল, বলপ্পাতারী সম্প্রদায়ে প্রচলিত ‘গুরুগ্রাম’ প্রথা। বলপ্পাতারী সম্প্রদায়ের "বহারাইন" নামক কুলগুরুগুণ শিষ্যের "ভূম-মন ধন" এর অভিভাবক
ছিলেন। এই অভিভাবকদের সীমারেখা বাড়াইতে বাড়াইতে ‘মহারাজ’ গণ শেষকালে এইরূপ একটি কুঞ্জি প্রাথমিক হয়ে করেন যে, শিষ্য বিবাহের পর আপন নব পরিণীতা বধুকে সর্বাগ্রে শুভর ভোগ-বিলাস চরিতার্থতর জন্য প্রেরণ করিবেন এবং তাহার পর পত্নীকে ‘এনাদ’ রূপে গ্রহণ করিবেন।

কার্নাস্তাস এই প্রথাকে তীব্র আক্রমণ করিয়া অপ্রতি প্রবঞ্চ সকল লিখিতে থাকেন। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে, মহারাজ গণ কার্নাস্তাসকে একাধারে করিবার চেষ্টা পান। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে, স্ত্রীর জনেক ‘মহারাজ’ সত্য্যাস্তারের সম্পদকের নামে মানহানির নালিশ রক্ষা করেন। মূল্য আদালতে নিভারাক্তকারা ঘোষণা করেন যে,—বলভাচারী গুরুর যোগদান ব্যাভিচারী এবং স্ত্রীর মহারাজ এরূপ ব্যাভিচার লিখি থাকেন। এই সামাজিক কুলপ্রধান উচ্ছেদ কামনা করা অপরাধ হইতে পারে না, সেজন্ত তিনি নির্দেশিত।

চঞ্চলিত বিচারের পর সুপ্রিম কোর্টের স্বাভাবিক অন্তর্ভুক্ত কার্নাস্তাস মূল্যের কেন্দ্রে খালাস প্রদান করেন ও তাহার সন্তান সাধারণের অভ্যস্ত প্রশংসা করেন। বিচার চলিত থাকাকালে, একেবারে গুরুত্বের কার্নাস্তাসকে আদালত হইতে বাহির হইবার সময় গুরুত্ব ভাবে জখম করে। কার্নাস্তাসকে নানাভাবে নির্যাতনের চেষ্টা গুরুর সর্ববর্ধন করিতে থাকিয়া তিনি বরাবরই অটল ছিলেন। কিন্তু নির্যাতনে মন নাম থাকিয়া দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে, ভগবান্ত মহারাজ কার্নাস্তাস মূল্যের মানবলীলা সম্প্রক্ষণ করিলেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল তাহার “Men And Events Of My Time In India” পুস্তকে তাহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন:

চঞ্চলির বিচারের পর সুপ্রিম কোর্টের স্বাভাবিক অন্তর্ভুক্ত কার্নাস্তাস মূল্যের কেন্দ্রে খালাস প্রদান করেন ও তাহার সন্তান সাধারণের অভ্যস্ত প্রশংসা করেন। বিচার চলিত থাকাকালে, একেবারে গুরুত্বের কার্নাস্তাসকে আদালত হইতে বাহির হইবার সময় গুরুত্ব ভাবে জখম করে। কার্নাস্তাসকে নানাভাবে নির্যাতনের চেষ্টা গুরুর সর্ববর্ধন করিতে থাকিয়া তিনি বরাবরই অটল ছিলেন। কিন্তু নির্যাতনে মন নাম থাকিয়া দেহ ভাঙ্গিয়া গেল। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে, ভগবান্ত মহারাজ কার্নাস্তাস মূল্যের মানবলীলা সম্প্রক্ষণ করিলেন। স্যার রিচার্ড টেম্পল তাহার “Men And Events Of My Time In India” পুস্তকে তাহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন:
Kursendas exposed this fell plague spot before the public with a persistency and moral courage which can be appreciated only by those who know that moral coercion and social torments can in a Hindu community be brought to bear upon recalcitrant individual... his life was probably shortened by the agitation of the controversy. However fateful may be the details of the immorality which he bravely combated, his career forms an episode deserving the best attention of moralists and reformers."

মানৰাজ ক্রী-শিক্ষা বিষয়

মেরী কার্পেণ্টারের ভারত ভ্যুণের অন্তর্গত স্কুল হইতেছে, ভারত সুর্য ক্রী শিক্ষা আন্দোলনের বিষয়, গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ক্রী শিক্ষা বিষয়ের উদ্দেশ্যে মহিলা শিক্ষালিঙ্গের প্রস্তাব বিষয়ক কর্মকর্তা নগর স্কুল স্থাপন ও নগর স্কুল পরীক্ষা প্রবর্তন। ক্রী শিক্ষা সম্পর্কে মানৰাজ, বাংলা ও বোংশাই এর অনেক পক্ষাধিকে ছিল। মেরী কার্পেণ্টারের মানৰাজ ভ্যুণের পর ঘাটার উদ্দেশ্যে সে প্রদর্শিত নারী শিক্ষার ব্যাপকতা ঘটে। কিন্তু ঘাটাতেও বহুদিন মানৰাজ বাংলা ও বোংশাই হইতে অনেক পক্ষাধিকে থাকে। এ সম্পর্কে ডাক্তার স্বভাবের ঘাটার 'History Of Education In Madras Presidency' নামক পুস্তকে বেশ স্বদর্শন বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে,

"It was only in 1866 that the subject of female education came under the serious consideration of Government, though previous to that year the several missions.
had taken practical steps towards the establishment of elementary schools for girls. The subject of course, naturally for many years past, engaged the attention of educated natives, but omitting the establishment of a few schools, in which elementary instruction was conveyed to girls of tender age by male teachers, the results were rather in words than acts. A stimulus was afforded to female education by a visit from Miss Carpenter, whose philanthropic exertions in England to improve the more neglected section of the community were well known.” (History Of Education In The Madras Presidency. pp. 73).”

“*It is right to notice here that the efforts, that the Maharaj of Vizianagram made to encourage female education on his estates. In 1868 he established a School at Vizianagram for Rajpoot and Brahmin girls at an annual cost of about 12000 Rupees.*” (History of Education In The Madras Presidency. pp. 75)
কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও, প্রথম দশ বৎসর মাঙ্গাঙ্গে মহি শিক্ষার প্রসার
তেমন আশ্চর্য হয় নাই। ১৮৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে, মাঙ্গাঙ্গের ডাইরেক্টর
অফ পালিক ইন্সটিটিউশনের রিপোর্ট বলা হইয়াছে যে,—এখানকার
স্কুলগুলিকে প্রকৃতপক্ষে ফিরিঙ্গি ও ইংরেজ বালিকাদের বিদ্যালয় বলা
চলে, কারণ এসব স্কুল যে সব ছাত্রী এই দশ বৎসর শিক্ষা লাভ
করিয়াছে তাহার মধ্যে বাট জন মাত্র হিন্দু ছাত্রী ছিল।
পঞ্চম অধ্যায়
ধারকানাথের যুগ

কেশবচন্দ্রের নারীমণ্ডল অগ্রসরের ধীরগতিতে অসহিষ্ণু হইয়া যে উপগতিবাদী দল এদেশে অভ্যসর নারী প্রগতি আব্দোলন আরম্ভ করেন, তাহাদের নেতা হন—বিক্রমপুরবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভুব "অবলা বাস্তব" ধারকানাথ গঙ্গাপাধ্যায়।

ধারকানাথ যখন কালীপাড়া কুলের ছাত্র, তখন অক্ষয়চন্দ্র দত্তের "মানব মনের সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থাগারে তাহার মনে যে সমাজে সম্প্রদায়ের স্পৃহা জাগে, তাহা পুরস্কারদী বলিত হইয়াছে। কুলীন ব্রাহ্মণের সম্প্রদায় ধারকানাথ বাল্যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন; কুলীনের স্পৃষ্ট অন্ত গৃহণ করিলে পারিত দোষ ঘটে, এই বিখ্যাতের মন তাহাকে প্রায়ই নিজ হস্তে অন্ত পাক করিয়া খাইতে হইত। একটি মর্যাদায়ী ঘটনা এহেন সনাতনী ধারকানাথের জীবনে বিপর্যয় ঘটায়।

কুলীন কঠোর ঠাঁচ ও ধারকানাথের জাগৃতি

যখন ধারকানাথের যুগে মাত্র সপ্তদশ বৎসর, তখন তাহার নিজ গ্রাম মানুষরথেন, তাহার অত্যন্ত পরিচিত ও স্বীকৃত এক কুলীন কঠোর বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। ধারকানাথ মানুষের এই নৃশংস বর্ধনতার কারণ অন্তরস্থা করিয়া জানিতে পারেন যে, কুলীন কঠোরদিগকে বধ করা তখনকার দিনে বিরল ছিল না। তৎকালে কুল মর্যাদার হানির ভয়ে অকুলীনকে কঠো সম্প্রদান করা চলিত না। বলিয়া বহু কুলীন কঠোকে
অবিবাহিত জীবন যাপন করিতে হইত, অথবা বহুদার স্ত্রীকে বিবাহ করিতে, এমন কি অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বিবাহ করিতেও বাধ্য করা হইত। সেই দিন ঘোষণার তাড়না বহু কুলীন কফতাকে কলকাতায় জীবন পানে টানিয়া লইত। সামাজিক কলকাতা এড়াইবার হয়, সময়ে সময়ে ইহাদের হত্যা করা সে সময়ে সমাজে চল হইয়া গিয়াছিল। হার্কানাথ অহুরমোহন করিয়া জানিতে পারেন যে, তাহাদের নিবাসেই দশ বৎসরের মধ্যে—বিনীত দেশীয় কুলীন কফতাকে বিব এবং হত্যা করা। হইয়াছে এবং সহসা কলকাতার আক্রমণে তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই মধ্যে রতনা করিয়া হত্যাকারীরা আইনকে ক্ষতি দিয়াছে। তখন পুলিসের শাসন গ্রামে এত প্রবল হয় নাই এবং মৃত্যুর কারণ লইয়াও তেমন তদন্ত সম্পন্ন ছিল না। বলিয়া এরূপ আচরণ বেশ অবাধে চলিতে পারিত।

এরূপ সমাজস্তম্ভী ঘটনার অবসান ঘটিতে হার্কানাথ পুরুষ-সঙ্গকে হইলেন এবং সেই দিন তাহাদের মাওলানা চালাইতে লাগিলেন। কুলীনপ্রথা-জনিত কষ্ট-হত্যা রূপ দুর্গন্ধের কলকাতা চর্চার বিদ্যমান করিবার উদ্দেশ্যেই মৃত্যু করিয়া হার্কানাথ ‘অবলাবাদক্র’ পত্রিকা। প্রকাশ করিতে অর্থস্বরূপ করেন। ‘অবলাবাদক্র’ সমাজবাদীরা তাহীতে অংশ নিজেই উক্ত পত্রিকায় লিখিত ছিলেন। ‘অবলাবাদক্র’ বহু চেষ্টা করিয়াও পাই নাই, কিন্তু হার্কানাথের দেহাবসান ঘটিলে ‘সাঙ্গীবনী’ পত্রিকা। তাহার যে সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়—১৮৯৮ স্বর্গোত্তর দোরা জুলাই প্রকাশ করেন, তাহাতে ‘অবলাবাদক্র’ হইতে সেই অংশটি উক্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে এই স্থানে উঠে পুনঃনবৃত্ত করিয়া দিতেছি।

“এদেশীয় কুল কষ্টাগ্র জীবনে যে বিষম চূড়া দূর্বতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাহাদের অগোচর নাই। কিন্তু মানুষ চক্ষু খালিতে অষ্ঠ, তাহারা ইহা দেখিতে পান না। যদি একটি
হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্নীকরি না করিত, হয়তো আমরা অজ্ঞান অসন্তাব থাকিতাম। একটি পরম স্নায়ুরী যুবভুক্তী কুলীন কন্যাকে তাহার আভ্যন্তরীণেরা বিষ প্রেরণ করিয়া হত্যা করেন। তখন আমাদিগের বয়স সম্পন্দশ বর্ধ। লোক পরম্পরা এই ঘটনা আমাদিগের অভিগোচর হইল। এইরূপে যাহার অপমুক্ত ঘটনা, আমরা তাহাকে নিন্দা, স্বভাবঃ আমাদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির নিকট শুনিলে পাইলাম, এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ঘটিয়া থাকে। অসন্তাব প্রবৃদ্ধ হইয়া জানিলাম, তাহার কথা সত্য; তৎপূর্ব সম্পন্দশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২২৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পায়ান না হইল, এ অবশ্যই তত্ত্ব না হইয়া পারে না। আমার ঘটনায় চাণক্য পত্তনের লোক সকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজীবির ঘোরতর বিদ্যায় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্বম দিক ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে, রূপার সামাজিক। এই সময় হইতে স্ত্রীজীবির প্রতি আমাদিগের মমতা জমিল। তখন ভাবিলাম, যদি বিদ্যা পরিমাণেও ইহাদের এই হৃদয় দূর্গতি দুর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। "এই অভিপ্রায়েই অবলাবাদবের ক্ষীণ হয়।" 

বিক্রমপুর পরগনায় অনেক যুবক আসিয়া দ্বারকানাথের সহযোগ হইলেন—তথ্যত্বের উত্তরকালে, সারদাকান্ত ও বরদাকান্ত হামদার, নবাব, লীলাকান্ত নিন্দিকাভূক্ত চট্টোধামী ও অধোরাণ চট্টোধামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই যুবকদের বিপম কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় শ্রেণি করিয়া তাহাদের সম্পত্তি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এইকালে তাহারা বহুবার নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছেন এবং রাজস্বারেও কেহ কেহ অভিযুক্ত হইয়াছেন।
বাংলার নারী-জাগরণ

এইভাবে একটি ব্রাহ্মণ কষ্ঠ—অর্থাৎ দেবীর সহিত পার্কেন্টিচরন
দাগাছাড়ার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। পার্কেন্টিচরন বিখ্যাত দালানের কুতুন
ছাত্র ছিলেন; তাহার বিবাহে ছাত্র মহলে আন্দোলন আরও তীর্থ
হইয়া উঠে।

অবলা বাংলা

ধারকানাথের বয়স যখন পলিশ বৎসর, তখন তিনি ফরিদপুরের
অন্তর্গত লোনসিংহ গ্রামে শিক্ষকতা করিতেন; এই সময়ে (১৮৮৯
ঋষিক্ষে) 'অবলা-বাংলা' নামে এক পার্ক্ষিক পত্রিকা বাহির করিতে
লাগিলেন। রাজাতির অধিকার প্রতিপল করিয়া, ধারকানাথ প্রতিস্থায়
'অবলা-বাংলা' অনল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আগের গিরিকে অন্ধুলারের
সহিত পত্তিত শিবনাথ শাক্তী এগুলিকে তুলনা করিয়াছেন।
'অবলা-বাংলা' ঢাকার ও কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে তুমুল অন্দোলন
আগাইয়া তুলিল।

কলিকাতার ছাত্রদের নায়ক, সংঘে কলেঘরের ছাত্র শিবনাথ
ভট্টাচার্য ( পরে পঞ্চ শিবনাথ শাক্তী ) ও উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( পরে
লেফেত্তান্ট উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ) ধারকানাথকে কলিকাতায় আসিতে
পাঠ্যে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কলিকাতা অভিষে
মিয়ার পক্ষে অনুকুল হইবে এই প্রভাবে, দৃঢ়-বৃত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্প্র
ধারকানাথ, প্রায় নিঃসরণ অবস্থায় ১৮৭০ খ্রীঃ বর্ষার সমায়কালে, কলিকাতায়
আসিলেন।

পঞ্চে শিবনাথ শাক্তী তাহার আত্মচরিতে এ সমস্ত লিখিয়াছেন যে—
"একদিন কলেঘরে পড়িতেছি, এমন সময় উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আসিয়া
আমাকে বলিল, ওরে ভাই অবলা-বাংলার এডিটর কলিকাতায় এলেছে,